—সচিত্র নূতন সংস্করণ—

# নির্ম্মাল্য

শ্রীরমা দেবী

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

পুনর্মুদ্রণ
আশ্বিন—১৩৫৪

প্রিন্টার—এস্, সি, মজুমদার
দেব প্রেস
২৪ নং, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

# আভাষ

রুদ্র সমাজ-মন্দিরের দ্বার খুলে, পূজারী বেরিয়ে এলেন।

দর্শকের দল ব'লে উঠলো—এ পূজা নয়, এ অনাচার—অশাস্ত্রীয়—নীতিবিরুদ্ধ!

পূজারী চমকিত হ'য়ে দাঁড়ালেন। নিঃশব্দে উৎসর্গীকৃত ঘট বেদীমূল থেকে তুলে নিয়ে, মন্দির-সোপানের সর্ব্ব নিম্নতলে আছড়ে ভাঙ্‌লেন!

জন-পদ-দলিত পূজার ফুল ম্লান হ'য়ে প'ড়ে রইলো।...

—কালের লীলায় তার অস্তিত্ব যায় যায়!

একদা পূজারীর গর্ব্বিত-দেহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোণিতকণা ছিট্‌কে এসে সেই দলিত ফুলের উপর ঝ'রে প'ড়লো।

সবাই ব'ল্লে—আবর্জ্জনা!

শোণিতকণা আদরে ফুলের বুকে মিশে গিয়ে কাঁদ্‌লো। তারপর অশ্রু মুছে, ভক্তি-আপ্লুত হ'য়ে ব'লে উঠলো—এ **নির্ম্মাল্য**!!

# নির্ম্মাল্য

## [ ১ ]

## আগমন

অতুল ধনবান্ সুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়ের মস্তক স্বরূপ—রাধারমণ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র—নির্ম্মল। আদরের দুলাল্, নয়নের মণি। অনেক বয়সে দ্বিতীয় সংসার করিয়া তবে রাধারমণের পুত্র জন্মিয়াছিল। তারপর, অবশ্য পুত্র-কন্যা অনেক গুলি; তা-বলিয়া কি নির্ম্মলের আদর কমে?

এ হেন স্নেহের সন্তান নির্ম্মল বিরক্ত ভাবে পিতার নিকট আসিয়া বলিল—ভোলানাথকে আর রাখা হবে না বাবা! বাইশ হাজার টাকার গাড়ীখানার দফা রফা করে ছেড়েচে। আমিও মরতে মরতে বেঁচে গেছি। ও কি-আর একটা ড্রাইভার?

রেশমী হরিনামের ঝুলিটা বার দুই মাথায় ঠেকাইয়া, পিতা বলিলেন—তা আজ আবার কি কোল্লে?

নির্ম্মল মুখ ফিরাইয়া বলিল—মেছোবাজারের মোড়টায় আর একখানা কারের সঙ্গে দিলে ভিড়িয়ে, ভাগ্যে তার সোফার ছিল খুব ভাল তাই রক্ষে। তবু সামনেটার রং-টং গেছে একেবারে!

পিতা বলিলেন—গাড়ী কারখানায় পাঠিয়ে দাও, রং কোরে দেবে এখন।

নির্ম্মল বলিল—তা তো দেবো; কিন্তু ভোলানাথকে আর গাড়ীর হুইল ধরতে দিচ্ছি না।

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে না হয় ছাড়িয়ে অন্য লোক রাখিলেই হবে।

বিরক্তিপূর্ণ-স্বরে নির্ম্মল বলিল—হবে কি—আজই নোটিশ দিন। আজ ত মাসের সাতাশ তারিখ হোলো, আমি ইংলিশ ম্যানে এস্তাহার দিচ্ছি।...এবার সাহেব ড্রাইভার রাখবো। ওসব ভেতো হাড়-গোড় বেরুনো লোক দিয়ে ইংলিশ-কার চালানো যায় না। না-হয় শ'দুই টাকাই যাবে সোফারের মাইনে দিতে! বলিতে বলিতে নির্ম্মল চলিয়া গেল। পিতা বার কতক যদিও ডাকিলেন—নিমু ও নিমু! শোন্ শোন্!

নির্ম্মল শোনা প্রয়োজনই বোধ করিল না।

* * * দিন দুই চারি পরে, একদিন প্রাতঃকালে রাধারমণ তাঁর অট্টালিকা সম্মুখস্থ উদ্যানে পাদচারণা করিতেছিলেন। অঙ্গে হরিচন্দনের পবিত্র চিহ্ন—তাঁহার সদ্য-সমাপ্ত পূজা-আহ্নিকের পরিচয় দিতেছিল। পরিধানে সাদা গরদের থান, পদে কাষ্ঠ-পাদুকা!

...আজ যৌবনের কোন কথা কি তাঁহার মনে আছে? কে জানে! এখন তাঁহার মুখে শুধু এককথা—"হরি হে দীনবন্ধু!"

বৃহৎ ভবন। প্রশস্ত মনোরম উদ্যান, দ্বারে দ্বারবান্, গৃহে অসংখ্য দাস দাসী, পরিচিত-মহলে বহু তোষামোদকারী। ...বৃহৎ বাস-ভবনে যদিও পরিজন অল্পই, তথাপি তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। গেটের

পার্শ্বে সারি সারি কতকগুলি ছোট ছোট ঘর। দ্বারবান্ হইতে কোচমান্, ভৃত্য প্রভৃতি সে সব ঘরে থাকে। তাহারই দুই তিন খানির উপর যে ঘর আছে, তাহাতেই সোফার ভোলানাথ মাইতি থাকিত। তাহার জবাব হওয়ায় সেই কক্ষ দুইটী এখন তালাবন্ধ।...

পদশব্দে কর্ত্তা ফিরিয়া দেখিলেন—দ্বারবানের সঙ্গে একটী লোক। লোকটী অল্পবয়স্ক, বয়স ২৫।২৬ হইবে। গৌরবর্ণ, ক্ষীণকায়, মস্তকে কুঞ্চিত কেশ, চক্ষে নিকেলের চশমা; অতি রূপবান্ যুবা! হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া রাধারমণ চমকিত হইলেন।...মরি মরি এমন রূপ মানুষের দেহে!

বিস্মিত প্রভুর চৈতন্য ফিরাইয়া, দ্বারবান্ হরিকিষণ সিং বলিল—হুজুর, ইনি বড় দাদাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। মোটারের কাজ করিবেন।

কর্ত্তা তাহার আপাদমস্তক বার কতক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

যুবা সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল—তিনি কি আপনার ছেলে? তা তো আমি জানি না, ইংলিশ্ম্যান পেপারে বিজ্ঞাপন দেখে, আমি চাকরির জন্য এসেছি।

রাধারমণ তাহার সুন্দর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—আচ্ছা, আমার গাড়ীখানা দেখ, যদি বোঝ, যে চালাতে পারবে, তাহ'লে তোমাকে রাখা যাবে।

যুবা নত মস্তকে বলিল—সব রকম ইংলিশ কার আমি চালাতে পারি, আপনার কি মেকারের গাড়ী?

তেজপূর্ণ কথা আর কাহারও মুখে কখনো শুনেন নাই। বলিলেন—কি রকম মাইনে চাও তুমি?

যুবা বলিল—মাইনে?…খেতে পরতে দেবেন আর আট টাকা করে কলেজের মাইনে দেবেন—বাস।

রাধারমণ অবাক্ হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

যুবা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—আরও কিছু আমি নেবো, কিন্তু সে এখন নয়—মাস কতক পরে। পরীক্ষায় যদি কৃতকার্য্য হই, তখন জানাব।

রাধারমণ বলিলেন—যাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি, তাকে আমি একশত টাকা করে দিতাম; তুমি নয় পঞ্চাশ নাও,…মোটে নেবে না কিছু?… সে কি!

যুবা পুনরায় মৃদু হাসিয়া বলিল—বোলেছি ত—দরকার হোলেই নেবো।

এমনি সময়ে নির্ম্মল আসিয়া দাঁড়াইল। যুবা তাহার প্রতি চাহিয়া নমস্কার করিল। নির্ম্মল অকস্মাৎ তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল—আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে।

—"আমার বোধ হয় সে অন্য লোক—!" বলিয়া যুবা মৃদু হাসিল। অতি করুণ অতি বিষণ্ণ সে হাসিটুকু!

রাধারমণ তাহাদের প্রতি চাহিয়া ভাবিলেন—কে-এ-কে-এ! অন্তরের জমায়িত স্নেহে এমন ভাবে ভাগ বসাইতে আসিয়াছে—কে? তাঁহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিল, মনে হইল—এ না আসিলেই বুঝি ভাল হইত। কিন্তু অন্তরাত্মা সে কথায় যেন ঠিক সায় দিল না।

যুবা অভিভূতপ্রায় পিতা-পুত্রকে সচেতন করিয়া নির্ম্মলকে বলিল—

চলুন না, গাড়ীখানা দেখে আসি,······আপনার পিতা ঠাকুর আমায় কাজে নিযুক্ত করেছেন যে।

নির্ম্মল বলিল—আসুন। হরিকিষন্! বেজার কাছ হতে গ্যারেজের চাবিটা চেয়ে আনো তো!···

উভয়ে লাল সুরকি ঢালা এবং দুধারে সিজিন-ফ্লাওয়ার ফোটা—সরু রাস্তা ধরিয়া, উদ্যানের অপর পার্শ্বে যেখানে ঘোড়া গাড়ী ও মোটর প্রভৃতি থাকিত, সেইদিকে চলিতেছিল; নির্ম্মল বলিল—আপনার নামটি কি মশাই?·· আমার নাম নির্ম্মল কৃষ্ণ সেন, বাবার নাম ত জানেনই—

যুবা মৃদু হাসিয়া বলিল—তা জানি, আপনার নামটি ঠিক আপনার চেহারার সঙ্গে মিলিয়েই রাখা হয়েছিল।

নির্ম্মল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—আপনার নাম ত কই বল্লেন না?

যুবা ঈষৎ ভাবিয়া বলিল—আমার নাম কিন্তু লোকে না ভেবেই রেখেছিল নির্ম্মলবাবু!—সুকুমার সেন।

নির্ম্মল বলিল—তা-হোলে আপনি সম্ভবতঃ আমাদের স্বজাতি! কেমন তো?

সুকুমার বলিল—আজ্ঞে।···

···ভৃত্য ব্রজনাথ, গ্যারেজের দ্বার খুলিয়া রাখিয়া, গাড়ীর ধূলা ঝাড়িতেছিল।

সুকুমার গাড়ীর নিকটস্থ হইয়া বলিল—ধাক্কা লেগে রং গুলো চটে গেছে বুঝি?

নির্ম্মল বলিল—ধাক্কা লেগেছিল আপনাকে কে বোল্লে?

সুকুমার বলিল—আপনাদের দারোয়ান হরিকিষন্ সিং।

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—হরিকিষন্ ব্যাটার কাছে যত পাবেন বাড়ীর খবর, তত হয়ত আমিও জানি না।

সুকুমার এই তরুণের উদারতায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—চাকরদের ওপর আপনার খুব স্নেহ দেখছি!

নির্ম্মল লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিল।

[ ২ ]

## মুক্তা

নির্ম্মল আহারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ঠাকুর, সুকুমার বাবু খেয়েচেন ?

ঠাকুর পরিবেশন করিতে করিতে বলিল—ওদিকে ত আমি যাই না বড় দাদা !...নারাণ ঠাকুর বাইরের লোককে সব দেয়।

নির্ম্মল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সম্মুখে উপবিষ্টা মাতার প্রতি চাহিয়া বলিল—সুকুমার বাবু কি বাইরেই খাবেন মা ? কেন, তিনি ত আমাদের জাত, আর ছেলে মানুষ ; বাড়ীর মধ্যে কেন ডাকলে না তাঁকে ?

মাতা বলিলেন—না বাবা, কর্ত্তা বারণ কোল্লেন, বোল্লেন বাইরের লোক, স্বভাব-চরিত্র না জেনে বাড়ীর মধ্যে আনা উচিত নয়।

নির্ম্মল বলিল—ভোলানাথ আর সুকুমার সমান হলো বাবার কাছে ?

মাতা সকৌতুকে পুত্রের বিরক্তিমাখা সুন্দর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন মাইনের চাকর, সেও যা এও তা।

নির্ম্মল হঠাৎ আহার বন্ধ রাখিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল—তা হোলে আর আমার কিছু বলবার নেই মা !

নির্ম্মলের ভগিনী বিজয়া বলিল—মা, সুকুমার বাবুকে দেখেননি দাদা, তাই ওকথা ব'লতে পারলেন ! দূর থেকে একটি নজর দেখে

এসো মা !'তা হ'লেই বুঝ্‌তে পারবে—ভোলানাথে আর সুকুমার বাবুতে কী তফাৎ।

মাতা বলিলেন—তা গায়ের রংটা নয় খুব ফরসাই হোলো, তা বোলে তার পেটে তো ঢুকিনি বাছা !…কার মনে কি আছে…

পুত্র রাগে রাগে আর বাক্যব্যয় মাত্র না করিয়া, প্রায় অনাহারেই উঠিয়া গেল।

মাতা ব্যগ্র হইয়া ডাকিলেন—ওরে নিমু ! খেয়ে যা ! না খেয়ে উঠ্‌লি কেন বাবা ?

নিমু কিন্তু আর দাঁড়াইল না—কোন্ কালে সে অদৃশ্য হইয়া গেছে।

কন্যা বিজয়াও মুখ ভার করিয়া বলিল—সত্যি মা, বড্ড ভাল লোক সুকুমার বাবু। আবার তিনি বিদ্বান্। একটা দিনও তুমি দুপুরে তাঁকে দেখ্‌তে পাবে না। এতক্ষণ হয়ত কলেজে চোলে গেছেন। প্রথম দিনই বাবাকে বোলেছিলেন যে, দুপুরে তিনি কোন দিন থাক্‌তে পারবেন না। কেবল সকালে আর বিকালে গাড়ী চালাবেন, তার জন্যেও তাঁকে কত রাত অবধি জেগে পড়তে হয়।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি এসব জানলে কেমন কোরে ?

কন্যা বলিল—আমার শোবার ঘর থেকে তাঁর ঘর দু'খানা দেখা যায় কিনা।…কাল অনেক রাত্রে আমি জল খেতে উঠেছিলাম, দেখলাম্—তখনও তিনি আলো জেলে পড়ছেন। তা ছাড়া আজ সকালে বিন্দু বলছিল।—সেও দেখেচে—অনেক রাত অবধি ড্রাইভারবাবু আলো জেলে পড়েন।

—তা বাইরের লোক…একদিনেই তো ভেতরে আনা চলে না মা !…

বেশ তো, ভাল হয়ে থাকুন, থাকতে থাকতেই বাড়ীর মধ্যে আসবেন এখন।...ভাল যে হয়, তাকে না বোলে কেউ থাকতে পারে?...

বিজয়া বলিল—সুকুমার বাবু বাবাকে বলেছেন—মাইনে চাই না, কেবল খেতে-পরতে দিলেই হবে। বাবা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন—টাকা না হোলে কি চলে? কিছু নাও! তিনি বোল্লেন—আর কারো না চলুক—আমার চলে। আমি নোব না।

মাতা বলিলেন—বোধ হয় বাপ টাপ আছেন, তাঁরাই দেবেন টাকা। কেবল কলকাতায় থাক্‌বেন বোলে তোমাদের চাক্‌রি নিলেন। এখানে থেকে পড়া শুনো কোরবেন, তোমরা স্বজাত কিনা, কাজেই খাবার দাবার অসুবিধে হবে না।

বিজয়া বলিল—না মা! ওঁর বাবা নেই—কেউ নেই। সাহায্য করবার লোক কেউ বেঁচে নেই। থাক্‌বার মধ্যে দেশে কেবল মা আছেন।

গৃহিণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—মাকে কিছু দিতে হবে না? তাঁর চ'লবে কিসে?

কন্যা বলিল—তাঁর নাকি কোনও কষ্ট নেই।

মাতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—তা তুমি এত খবর জানলে কি কোরে?

কন্যা স্মিতমুখে বলিল—দাদা যে সুকুমার বাবুর কাছে রোজ পড়ে। দাদাকে উনি সব কথা বলেছেন। দাদা আবার বাবার কাছে সব খুলে বলেছে। আমি সে দিন বাবার কাছে ছিলাম, বাইরের ঘরে নন্দলাল কাকাকে বাবা বলছিলেন, তাই শুনলাম।

[ ৩ ]

## সাক্ষাৎ

বৈকালে নির্ম্মল যখন পোর্টিকোতে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সুকুমার গাড়ীখানির এটা ওটা টিপিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া বলিল—কোন্ দিকে যাবেন?

নির্ম্মল শকটে আরোহণ করিতে করিতে বলিল—যে দিকে আপনার ইচ্ছে।

গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া সুকুমার নিজ আসনে উঠিয়া বসিল। বলিল—তবু বলুন না?

নির্ম্মল ঈষৎ হাসিয়া বলিল—চিৎপুর সাইড্ দিয়ে চলুন না! বেশ অনেক কিছু দেখা যায়।

তখন প্রায় সন্ধ্যা, পোর্টিকোতে অন্ধকার। ইলেকট্রিক বাতি গুলি না জ্বলিতে থাকায়, সুকুমার নির্ম্মলের মুখ দেখিতে পাইল না। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—চিৎপুর সাইডে যাবেন, কিন্তু আপনি ত ছেলে মানুষ, কি দেখবেন সেখানে? বরং তার চেয়ে গঙ্গার ধারে ইডেন্ গার্ডেনের বাইরে বাইরে বেড়িয়ে এলে, শরীর মন দুই তাজা হবে। তা ছাড়া চিৎপুরে সন্ধ্যার পর বড্ড ভিড়, ধাক্কা লাগার ভয় আছে। ওদিকে না যাওয়াই উচিত।

নির্ম্মল তথাপি ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলিল—কিন্তু কেবল গাছ আর মাটী দেখে কি সময় কাটবে?

সুকুমার বালকের বালকত্বে মৃদু হাসিয়া বলিল—তার মত নিরাপদ সহচর আর নেই ভাই! আজ ত আমি বেড়িয়ে আনি, ভাল না লাগে—কাল চিৎপুরেই নিয়ে যাবো।

নির্ম্মল আর কিছু আপত্তি না করিয়া বলিল—আপনার যেখানে খুসী চলুন।

সুকুমার মৃদুভাবে গাড়ী চালাইলেও, মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ী সহর ছাড়াইয়া গঙ্গার ধারে পৌছিল। ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইতে চালাইতে সুকুমার নির্ম্মলকে বৃক্ষ-তত্ত্ব বুঝাইতেছিল। বৃক্ষসমূহের দ্বারা সাধারণতঃ মানুষের কি উপকার সাধিত হয়, এই সমুদয় অতি সুললিত প্রাঞ্জল ভাষায় সুকুমার বুঝাইতে লাগিল।··নির্ম্মল অষ্টাদশবর্ষীয় যুবা। ধনী-সন্তান হইলেও কলেজে পড়িত। বঙ্গবাসী কলেজে সে বোটানির ছাত্র। তন্ময় হইয়া সে সুকুমারের কথা শুনিতেছিল। সুকুমার থামিলে, সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সহিত বলিল—সুকুমার বাবু! মোটর-ড্রাইভারী না কোরে, আপনার বোটানির প্রফেসারি কল্লেই শোভা পেত।

সুকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল—যার যা নিয়তি নির্ম্মল!···অন্যমনস্ক থাকায় সে 'বাবু' বলিতে ভুলিয়া গেল।

নির্ম্মল খুসী হইয়া বলিল—আজ থেকে আর 'নির্ম্মলবাবু' বোলবেন না দাদা! আমি আপনাকে 'দাদা' বোলবো, আপনি আমায় 'নির্ম্মল' বোলবেন। আপনার কাছে আমি বাবু নই, শুধু 'নির্ম্মল'।

সুকুমার ম্লান গাম্ভীর্য্যের মধ্যেই খুসীর ভাব আনিয়া বলিল—বেশ, তাই হবে নির্ম্মল!

পাশ দিয়া আর একখানি বৃহৎ মোটরকার ধীর-গতিতে চলিয়া

আসিয়া, প্রায় মুখো-মুখি হইতেই, এক স্ত্রীকণ্ঠে উচ্চারিত মৃদুস্বর শুনা গেল—"সুকু—সুকু—বাবা।"

আনমনা সুকুমার এই আকস্মিক আহ্বানে এমন চমকিত হইল যে, গাড়ীখানি হঠাৎ থামিয়া গেল। নির্ম্মল চাহিয়া দেখিল—এক-মাত্র স্ত্রী আরোহিণী, সেই বহু মূল্যবান্ মোটরে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, ড্রাইভার ব্যতীত অন্য কোন লোক নাই। তাঁহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সারা দেহ একখানি রেশমী চাদরে ঢাকা। মুখের সামান্য অংশ যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহাও বড় সুস্পষ্ট নহে। কারণ তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে!...

সুকুমার মুহূর্ত্তমাত্র তাহার স্তব্ধ গাড়ীখানার হুইলে মাথা রাখিয়াই, হঠাৎ তীরবেগে গাড়ী চালাইয়া দিল। দামী মোটরখানা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।—তাহার আরোহিণীর সম্বন্ধে কোন কৌতূহলই বাহিরে প্রকাশ পাইতে দিল না।

বাড়ী পৌঁছিয়া, নির্ম্মলকে নামাইয়া দিয়া, সুকুমার গাড়ী রাখিতে গ্যারেজে চলিয়া গেল।......

রাত্রে পড়িতে আসিয়া, সুকুমারের অসাধারণ গম্ভীর মুখ দেখিয়া, যেমন তেমন একটা ছোট-খাটো কথাও জিজ্ঞাসা করিতে বালক নির্ম্মলের সাহসে কুলাইল না।

[ ৪ ]

## সংশোধন

সুকুমার তাহার ক্ষুদ্র কক্ষে তক্তাপোষের উপর শুইয়া, পাঠ্য পুস্তকে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল।

দুইমাস সুকুমার রাধারমণ সেন মহাশয়ের নিকটে চাকুরী করিতেছে। তাঁহাদের অশেষ আত্মীয়তাসূচক ব্যবহারেও সে অটল। তাহার গাম্ভীর্য্যের অভেদ্য বর্ম্ম ভেদ করিয়া, নির্ম্মল কি আর কেহই তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারে নাই। সে স্ব-ইচ্ছায় যতটুকু মিশিত, তাহা ভিন্ন কেহ তাহার নিকট কোনরূপ সৎ কি অসৎ ব্যবহার পাইত না। বাহিরে খাওয়ার ব্যবস্থা আজিও তেমনি রহিয়াছে, সে বাড়ীর মধ্যে যায় না। সকালে অবকাশ নাই—কলেজ আছে—তাড়াতাড়ি। রাত্রেও পড়া-শুনা আছে, বাড়ীর মধ্যে মার কাছে গেলে দেরী হইবে ইত্যাদি।...নির্ম্মলের মাতাকে সে বড় বেশী দেখে নাই, কোনো পাল-পর্ব্ব উপলক্ষে দেবতার স্থানে যাইবার জন্য যা দুই এক বার তিনি মোটরে উঠিয়াছেন। অবশ্য তিনি সুকুমারকে লজ্জাও করেন না, বরং দুই একটী কথাও কহিয়াছেন। কিন্তু তথাপি সুকুমার নির্ম্মলের মাতা বা ভগিনীগণের সহিত আত্মীয়তা করিতে অসম্মত।

নির্ম্মলের অপর দুই ভ্রাতা অতুল ও জীবন, তাহারা কিন্তু সুকুমার দাদার সঙ্গে অত্যন্তই বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিয়াছিল। অতিশয় কৌতূহলের সহিত তাহারা সুকুমারের বৃহৎ বৃহৎ পাঠ্য পুস্তকগুলি নাড়া-চাড়া

করিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিত—"দাদা, এ গুলো সব আপনি পোড়বেন?" সুকুমার বলিত—"পড়া হয়ে গেছে ভাই! এবার পরীক্ষা দেবো।"

তাহারা এই প্রিয়দর্শন তরুণটীর বিনয় ও বিদ্যার অসাধারণত্বে বরাবরই বিস্মিত ছিল। বিজয়া কিন্তু যখন তখন আসা-যাওয়া করিতে কুণ্ঠিত হইত। সে ভিন্ন, ললিতা, গৌরী এরা সব ছিল সুকুমারদা'র গোঁড়া ভক্ত এবং উপাসক, কত সুখ্যাতি যে তাহারা গিয়া বিজয়ার কাছে করিত তার ঠিকানা নাই! দিদি জিজ্ঞাসা করে, "এখন সুকুমারদা কি কোচ্চেন যে ললিতা?" তাহারা উভয়ে বলিয়া উঠে "পোড়ছেন দিদি!...তিনি খালি পড়েন, আবার এমন সুন্দর বাজনা বাজান যে, তেমন তুমি কখন শোননি ভাই!"

দিদি জিজ্ঞাসা করে—"কেমন বাজান্ রে? কোথায় বোসে বাজান্? আমরা ত কই শুনতে পাই না?" সেইখানে হয় ত ছোট ভাই জীবন ছিল—সে বলিয়া উঠে—"পেছনের বারাণ্ডায় বোসে বাজান দিদি! তাই তো বাড়ী থেকে শুনতে পাওয়া যায় না!"

অতুল চোদ্দ-পনের বছরের বালক; সে বিজয়া অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়; কাজেই সে আপনাকে তাদের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ ভাবিত। সে বলে—"সুকুমারদা যে বীণ্ বাজান্! তার আওয়াজ কি বেশী জোর, যে এখান থেকে শুনতে পাওয়া যাবে?"

বিজয়া পরম আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা মেজদা! সুকুমারদা হারমোনিয়ম্ বাজাতে জানেন?"

অতুল অসঙ্কোচে বলে—"নিশ্চয়ই জানেন।"

বিজয়া বলে—"আচ্ছা জিজ্ঞেস কোরো না মেজদা! কিন্তু খবরদার—আমার নাম কোরো না ভাই!" অতুল বলে,—"বাঃ, তোর কথাই ত বোলতে হবে। তুই জিজ্ঞেস কোরছিস্, না বোল্লে হবে কেন?"

বিজয়া বলে—"কেন হবে না, কেন? তুমিই যদি জান্‌তে চাও?"

অতুল বলিয়া ফেলে—"কেন? কী হবে জেনে?" বিজয়া সাহসে ভর দিয়া বলে—"আমি তা হোলে ওঁর কাছে শিখতাম মেজদা!"

* * * *

পাঠরত সুকুমারকে সচেতন করিয়া, গৃহাগত নির্ম্মল ডাকিল—"দাদা!"

সুকুমার মুখ তুলিয়া তাহার প্রতি চাহিল, বলিল—এত রাত অবধি কোথায় ছিলে, নির্ম্মল?

নির্ম্মল অবনত মুখে বলিল—ওই—ওরা ডেকে নিয়ে গেছলো। সেখানেই রাত হোল। আমি এখন পোড়লে কি তোমার ক্ষতি হবে দাদা?

সুকুমারের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, স্বভাব-বিরুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিল—ক্ষতি নির্ম্মল? আমার আর তুমি কি ক্ষতি কোরবে? কিন্তু নিজের যে ক্ষতি কোরেছ, তা কতদিনে শোধরাবে বলতে পার?

নির্ম্মল তাহার নিকটে বসিয়া পড়িয়া, উভয় হস্তে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—দাদা, আজ তুমি আমায় বেড়াতে নিয়ে গেলে না কেন? তা'হলে তো ওরা আর আমায় পেত না। তুমি আমায় ওদের হাত থেকে রক্ষা কর দাদা! আমাকে বাঁচাও। আমি যে চেষ্টা ক'রেও সব সময় সামলে উঠ্‌তে পারি না। পাঁচজন সঙ্গীসাথীর অনুরোধ……আমাকে ভাল কোরে নাও সুকুমার দা!

সুকুমার অনুতপ্ত যুবার পৃষ্ঠে সস্নেহে হস্ত বুলাইয়া বলিল—নিজেকে নিজেই রক্ষা করা যায় ভাই, আর কেউ পারে না; তোমার চেষ্টা আছে, প্রাণ আছে, তুমি পারবে। তারপর—সহসা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—তুমি মানুষ হও নির্ম্মল! এইটুকুই আমার সব চাইতে বড় আশা!...আমি তোমাকে মানুষ দেখতে চাই!

নির্ম্মল কাতর কণ্ঠে বলিল—তা জানি দাদা, তুমি যত আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, তত আমার বাবাও নন। ওই নরু, শিবু ওরা জিজ্ঞেস কোল্লে—নির্ম্মল যাবে? বাবাও অম্নি বল্লেন—যাক্। আজ যদি বাবা 'না' বোলতেন!...সেখানে আমায় ওরা কিছুতেই ছাড়লে না যে—

সুকুমার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—রাত দশটা অবধি ওদের সঙ্গে কোথায় গেছলে? কে কে ছিল সেখানে?

নির্ম্মল অবনত মুখে মৃদুস্বরে বলিল—কাশীপুর...নরুদার বাগানে। সেখানে অনেক লোক ছিল, আমি সবাইকে চিনিও না।

—"তারপর?" বলিয়া সুকুমার তাহার স্বভাব-সিদ্ধ মৃদু হাসিল।

নির্ম্মল অতিশয় লজ্জায় তাহার ধৃত হস্তখানা পুনরায় চাপিয়া ধরিয়া বলিল—মাপ কর দাদা, আর এ জীবনে এমন কাজ আমি কোরবো না, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি।

সুকুমার মৃদু হাসিয়া সস্নেহে বলিল—প্রতিজ্ঞা ক'রে নিজেদের আমরা হীন কোরে ফেলি নির্ম্মল! কথাই যথেষ্ট, মনের এই গ্লানিপূর্ণ অনুতাপই মনে রাখবার জন্য অনেক নয় ভাই? আজ তোমার মনে যে লজ্জা আর ঘৃণা হোলো, এই তোমাকে সংসারের পিচ্ছিল পথ থেকে রক্ষা কোরবে নিমু!

তারপর নির্ম্মলকে উভয় হস্তে সুকুমার বক্ষে টানিয়া জড়াইয়া ধরিল। দেখিল নির্ম্মল কাঁদিতেছে; সে তাহার মস্তক টানিয়া বক্ষে ধরিয়া রাখিল। মৃদু-স্নেহ-পূর্ণ স্বরে বলিল—নির্ম্মল! তুমি ফুলের মত নির্ম্মল হও! তোমার নির্ম্মল নাম নারায়ণ সার্থক করুন।...

...সুকুমারের ব্যাকুল-আঁখির অবিরল অশ্রু নির্ম্মলকৃষ্ণের মস্তকে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

[ ৫ ]

## কে—এ ?

রোগীর কক্ষ। রাধারমণ সেন মহাশয়—সাংঘাতিক পীড়িত। বাঁচিবার আশা নাই।

ডাক্তার বলিলেন—প্রতাপবাবু, রাত্রে অক্সিজেন্ দিতে হবে। আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি, স্কটুটম্সনের বাড়ী থেকে আনিয়ে নেবেন। আজ একজন ডাক্তার দরকার হবে বোধ হয়। আপনাদের এ পাড়ার কোনো জানা ডাক্তার নেই ? আমার জানা-শোনা একটী ডাক্তার আছে, মাস কতক হোলো বেরিয়েচে, খুব চালাক আর হুঁসিয়ার। বলেন ত তাকেই পাঠিয়ে দিই।

রাধারমণ সেনের ম্যানেজার প্রতাপচন্দ্র বসু বলিলেন—আমাদের জানা-শোনা তেমন লোক কই মনে পড়ছে না ত। আপনিই ঠিক কোরে দিন ডাক্তারবাবু! ভাল লোক দেবেন,—বাড়ীর মধ্যেই যখন সমস্ত রাত থাকতে হবে—

ডাক্তার বলিলেন—না, সে বিষয়ে কোনও চিন্তা কোরবেন না, ভাল লোকই দেব পাঠিয়ে!—

সুকুমার এতক্ষণ টেবিলের উপর হেলান দিয়া বিখ্যাত ডাক্তারমহাশয় কর্তৃক লিখিত কাগজগুলি দেখিতেছিল, মুখ তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আমিই অক্সিজেন্ দেব ডাক্তারবাবু, ডাক্তার না হোলেও চোলবে, কোনও চিন্তা নেই।

ডাক্তারমহাশয় জানিতেন—এই নবীন যুবা রাধারমণ সেনের মোটর চালক মাত্র। তিনি দৃষ্টিতে বিস্ময় ভরিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। বলিলেন—আপনি ওটা-চার্জ-টার্জ কোরে নিতে পারবেন ত ?

সুকুমার মৃদু অস্ফুট স্বরে তাহার কাছে নিজ বিদ্যার যে পরিচয় দিল, তাহাতে ডাক্তার, প্রতাপবাবু ও উপস্থিত সকলেই বিস্মিত ভাবে তাহার সুকুমার শ্রীমণ্ডিত ঈষৎ ক্ষীণ দীর্ঘ দেহের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে বিচক্ষণ বৃদ্ধ ডাক্তার বলিলেন—তবে আর কথা কি, আপনিই দেবেন। দশমিনিট অন্তর তিনমিনিট কোরে—বুঝেচেন ?...সমস্তই লেখা রইলো। ভরসা করি কাল আশাতীত সুফল পাবো। তারপর নির্ম্মলের বিষণ্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—ব্যস্ত হয়ো না নির্ম্মল। সেন মশাই আরাম হয়ে যাবেন, ভয় কি ? ..

ডাক্তার চলিয়া গেলে নির্ম্মল বলিল—অক্সিজেন্ কেন দেয় দাদা ? সুকুমার তাহাকে অক্সিজেনের উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া বলিল—তুমি গিয়ে ততক্ষণ বাবার কাছে থাক নিমু, আমি মোটর নিয়ে চট্ ক'রে ওষুধ-গুলো নিয়ে আসি।...

...অক্সিজেন্ লইয়া আসিয়া সুকুমার হেড্ পরিচারক ব্রজকে ডাকিয়া বলিল—ব্রজনাথ! বাবুর কাছে এখন থেকে আমায় সমস্ত রাত থাকতে হবে,—মাকে বল গিয়ে।

ব্রজ অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া উপরে গেল। নিজ বৃহৎ সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষের বৃহৎ পালঙ্কে রাধারমণ সেন মহাশয় শায়িত—অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতপ্রায়! গৃহিণী শিয়রে বসিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। সুকুমার গৃহপ্রবেশ করিতে মুহূর্ত্ত ইতস্তত

করিল, তৎপরে কর্ত্তব্যের অনুরোধে, নিজেকে ভীষণ দায়িত্বের মধ্যে নিযুক্ত করিল। অতি সতর্কতার সহিত সে দরকারী জিনিষপত্র এবং ঔষধ ইত্যাদি নিকটস্থ টেবিলে সাজাইয়া ফেলিল; ছোট একখানি খাতায় তারিখ দিয়া রাখিল। তাহাতে ডাক্তারের অবগতির জন্য সমস্ত রোগ-বিবরণ লিখিবে বলিয়া থার্ম্মোমিটার, ফাউণ্টেনপেন্ ইত্যাদি সমস্ত সে লইয়া আসিয়াছিল, যথাযথ গুছাইয়া লইয়া ঘড়ির প্রতি চাহিয়া দেখিল—সাতটা বাজে। তখন সময় বুঝিয়া, অক্সিজেন্-প্রয়োগে মনোনিবেশ করিল।

নির্ম্মলের মাতা দেখিয়া দেখিয়া উচ্ছ্বসিত স্নেহে বলিলেন—সুকুমার! বাবা! জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে ছিলে নিশ্চয়।

সুকুমার আপন শান্ত চক্ষু তুলিয়া গৃহিণীর প্রতি চাহিল। মৃদুস্বরে বলিল—জন্মান্তরে নয় মা, এ জন্মেই আমি আপনার সন্তান যে!···

···রাত্রি বারোটা, কলিকাতার পথঘাট নির্জ্জনতার সীমায় আসিয়াছে। রোগীর মুখপানে দৃষ্টি-নিবদ্ধ সুকুমার নীরবে বসিয়া!

অতি কুণ্ঠিত-পদে বিজয়া আসিয়া বলিল—মা আপনাকে খেতে ডাকছেন।

সুকুমার চমকিত হইয়া বলিল— অঁ্যা!—খেতে?—আমাকে? কিন্তু··· বাবার কাছে কে থাকবে?

বিজয়া বলিল—আমিই থাকি।, আপনি খেয়ে আসুন।

সুকুমার বরফের ব্যাগটা বিজয়ার হাতে দিয়া বলিল—এই চেয়ারে বোসো, বোসে—এমনি ক'রে মাথায় এটা ধ'রে রাখো।···হ্যাঁ হয়েচে, পারবে তুমি।···বেশী দেরী হবে না, আমি এখুনি খেয়ে আসচি।

…সুকুমার আহারান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—'আইস-ব্যাগ' ফেলিয়া বিজয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে! সুকুমার তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিল—এ কি, কী হোলো বিজয়া? কাঁদচো কেন?

বিজয়া উচ্ছ্বসিত রোদন কোনমতে সংবরণ করিয়া বলিল—দেখুন না, বাবা কি সব বলছেন!

—"কি" বলিয়া সুকুমার পুনরায় আইস-ব্যাগ তুলিয়া মস্তকে চাপিয়া ধরিয়া শুনিল—অতি মৃদুস্বরে রাধারমণ বলিতেছে—"যেমন তেমন পাপ তো নয়, সে যে মহাপাপ! সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি আছে?—এত দিনে এত বড়ই ত হবার কথা। না—না চ'লে যা—চ'লে যা—আর মমতা বাড়াস্‌নি,…কেন ফিরিয়ে দিতে পারলুম না! আর পারি না…বুকে টেনে নিই… না—না!"

সুকুমার নাড়ী দেখিল, থার্ম্মোমিটার দিয়া তাপ পরীক্ষা করিল, তারপর আর একবার অক্সিজেন্ দিল। বিজয়াকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—বিজয়াদিদি! কেঁদ না! বিকারে অমন ভুল সকল রোগীতেই বকে। বাবা ভাল হবেন, ভয় কি? মার কাছে যাও।

বিজয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সুকুমার মনে করিতে চাহিল ইহা বিকারের প্রলাপ। কিন্তু এ অসংবদ্ধ প্রলাপ না আর কিছু!—চিন্তার ক্লান্তিতে সে অবসন্ন হইয়া উঠিল!—না না…আর যে সে ভাবিতেও পারে না! চিন্তার জ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সুকুমার একখানি পুস্তক টানিয়া লইল। কিন্তু পড়িবে কি—দশমিনিট বাদে অক্সিজেন্ দিবার ব্যবস্থা যে!…

চিন্তা ও কার্য্যের মধ্য দিয়া দুঃখের নিশি প্রভাত হইয়া আসিল।

যথাসময়ে ডাক্তার রোগী দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন, সুকুমারের কার্য্য-তৎপরতার প্রশংসা করিয়া বলিলেন—সুকুমারবাবু! রাধারমণবাবুকে এ-যাত্রা আপনিই বাঁচালেন—একথা প্রত্যেকেরই বোলতে হবে।

সুকুমার মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ডাক্তার তাহার রুক্ষ মুর্ত্তির প্রতি চাহিয়া বলিলেন—যান্ বিশ্রাম করুন গিয়ে, দিনের বেলায় আর আশঙ্কা নেই। বিশেষতঃ এখন রোগ ভালর দিকেই যাবে। দু-দশদিনেই সেরে উঠবেন—আশা করা যায়।...

* * * রাত্রে পুনরায় সুকুমার বাটীর মধ্যে আসিয়া সম্মুখেই গৃহিণীকে দেখিয়া দাঁড়াইল। তিনি অনুযোগ করিয়া বলিলেন—সুকুমার! সমস্ত দিন তোমায় একবারও দেখিনি কেন বাবা? খেতে শুদ্ধ এলে না। কোথায় কি খেলে না খেলে দেখলাম না।

সুকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল—দিনের বেলায় আজ আর কিচ্ছু খাই নি মা! খাবার দরকার হয় নি। তাই আপনার কাছেও আসি নি।

উদ্বিগ্ন হইয়া গৃহিণী বলিলেন—কেন খাওনি বাবা? শরীর ভাল আছে ত? ডাক্তারবাবুকে একবারটি হাতখানা দেখালে না কেন?

সুকুমার তাঁহার ব্যাকুলতায় লজ্জিত হইয়া বলিল—না না, তেমন কিছু নয়, রাতটা জেগে, কেমন মাথা ধরেছিল, তাই ভয়ে কিছু খাই নি। এবেলা খাবো এখন।

গৃহিণী বলিলেন—তবে এখন কর্ত্তার কাছে যাও, আমি আহ্নিকটা সেরে নিয়েই খাবার দিচ্ছি।

সুকুমার চলিয়া গেলে, গৃহিণী তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ভাবিলেন—এই মুখ আর আমার নিমুর মুখ এক ছাঁচে ঢালা! কে জানে কেন

এমন সাদৃশ্য! কথনো ত পরিচয় দিলে না!—কোথায় বাড়ী, কে আছে, তা-ও এই তিন মাসের মধ্যে আমরা কেউ জানতে পারলাম না।

[ ৬ ]

## আগুন সো অব সুন্দরী বালা

রাধারমণ আরোগ্য লাভ করিলেন। সুকুমার সেই সময়ের মধ্যে যে কিরূপে সকলের অত্যন্ত আপন হইয়া পড়িল, তাহা কি কর্ত্তা-গৃহিণী, কি পুত্র-কন্যা, দাস-দাসী, কি সুকুমার নিজে, কেহই কিছু বুঝিল না। এখন সুকুমার বাড়ীর মধ্যে আহার করে। অনেক সময় অকারণে বসিয়া গৃহিণীর সঙ্গে গল্প করে, ছোট বালক-বালিকাদের সঙ্গে খেলা করে। মোটরে বেড়াইতে লইয়া যায়। এখন মোটরে আর নির্ম্মল একা বেড়ায় না, রাধারমণ সেন স্বয়ং সন্ধ্যাকালে গঙ্গার ধারে ও গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে যান।

কর্ত্তার রোগে বড় পড়া-শুনার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া, সুকুমার আজ-কাল আর বড় গল্প করিতে পারে না. সকাল সকাল আহারাদি করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া যায়।···

সেদিন ফিরিবার সময় দেখিল, হলের দরজা বাহির হইতে বন্ধ। অগত্যা সে অপর পার্শ্বের একটি ছোট কক্ষে প্রবেশ করিল। ইচ্ছা—বাহিরে চলিয়া যাইবে। প্রবেশ করিয়া দেখিল—নির্ম্মল হারমোনিয়ম বাজাইতেছে আর বিজয়া ঝুঁকিয়া দেখিতেছে। কিছুক্ষণ শুনিয়াই সুকুমার বলিল—ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ ঠিক হচ্ছে না ত নিমু!

নির্ম্মল বাজনা ফেলিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি একটু বাজাও না দাদা!

সুকুমার বলিল—আমি বাজাতে জানি—কে বোল্লে তোমায়?

নির্ম্মল খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—না জান্‌লে ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজের দৌড় বুঝলে কেমন ক'রে? সে হবে না দাদা! তোমাকে বাজাতেই হবে। নির্ম্মল মহা টানাটানি বাধাইয়া দিল।

অগত্যা সুকুমার হারমোনিয়মের সামনে বসিয়া বলিল—কি বাজাই বল তো?

নির্ম্মল বলিল—সে আমি কি জানি? তোমার যা ইচ্ছে।...অনুরুদ্ধ সুকুমার হারমোনিয়ম ধরিয়া গাহিল—

"তুমি সুন্দর তাই তোমারি বিশ্ব
সুন্দর শোভাময়,
তুমি উজ্জ্বল তাই তোমারি মুরতি
নন্দন প্রভাময়।"

উভয় শ্রোতা মুগ্ধ! এমনি আনমনা যে, কখন পিতা প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাহারা তাহা জানিতেও পারে নাই। গীত বন্ধ করিয়া উঠিতেই, সুকুমার কর্ত্তাকে দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। তিনি তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন—যেও না সুকুমার, বোসো,...কী সুন্দর গাচ্ছিলে তুমি! বুড়োকে একটু কীর্ত্তন শোনাও ত বাবা!

অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়া, সুকুমার কিছুক্ষণ বাজাইয়া পরে বিদ্যা-পতির সুললিত পদাবলী হারমোনিয়ম-যোগে গাহিল—

"আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা!"

তাহার সুশিক্ষিত সুমিষ্ট কণ্ঠ পঞ্চমে ধ্বনিত হইয়া সারা অট্টালিকা

ঝঙ্কৃত করিতে লাগিল। সেই মনোহারী সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া বহু দাস-দাসী কক্ষ-দ্বারে সমাগত হইল। নির্ম্মলের মাতা দ্বিতল হইতে নামিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন। লজ্জা করিবার মত কক্ষে কেহ নাই দেখিয়া, তিনিও ভিতরে আসিলেন। নির্ম্মল মাতাকে একখানি কাষ্ঠাসন আগাইয়া দিলে, তিনি মন্ত্র-মুগ্ধবৎ তাহাতে বসিয়া পড়িলেন। সুকুমার এ সকল কিছুই লক্ষ্য করিল না। সে তখন একমনে গাহিয়া চলিয়াছে—

"সো হ' কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা!"

গীতটা যথানিয়মে সমাপ্ত করিয়া, সুকুমার মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইল—গৃহিণীকে। সে বাজনা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন—উঠলে কেন সুকুমার? আর একটু গাও। এমন কীর্ত্তন ত কখনও শুনি নি!

অগত্যা সুকুমার পুনরায় আসনে বসিয়া পড়িল, এবং নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া, গীত-বাদ্যে কর্ত্তা-গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিল। সে গাহিল—"তোমারই গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমারি রূপে!" "জনম জনম হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল!" ইত্যাদি বিখ্যাত সুললিত পদ। যখন তাহাদের কর্ণে সশব্দে ঘটিকা-যন্ত্র—রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষণা করিল, তখন চমকিত হইয়া গৃহিণী বলিলেন—এ আমরা কী করছি! নিজেদের সুখ ভাবতে গিয়ে বাছার আমার কষ্টের একশেষ করে দিলাম যে! সুকুমার! থাক্ থাক্, আজকের মতো বন্ধ করো বাবা!

তুমি সমস্ত রাত গাইলে, সমস্ত রাতই যে এমনি ঠায় ব'সে ব'সে কেটে যাবে!...তোমার দেহ ভাল নেই, যাও—শোওগে। সুকুমার অতি বিনীত ভাবে গান বন্ধ করিয়া, ধীর পদক্ষেপে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।...

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সুকুমার মোটর লইয়া আসিয়া অন্দরে সংবাদ পাঠাইল—বেড়াতে যাবার সময় হয়েছে।...কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া কর্ত্তা রাধারমণ বলিলেন—বেড়াতে যাব না সুকুমার!

—"কেন?" বলিয়া সুকুমার তাহার প্রতি চাহিল। তিনি সহাস্যে বলিলেন—না বাবা, বেড়াতে যেতে ইচ্ছা কোরছে না, তার চেয়ে কালকের মত তুমি আমায় দুটো কীর্ত্তন শোনাও।

সুকুমার হাসিয়া বলিল—না গেলে তো আপনার শরীর সারবে না। একটু বেড়িয়ে এসে, তারপর গোবিন্দদাস মশাই এলেই কীর্ত্তন শুনবেন।

কর্ত্তা ব্যস্ত ভাবে বলিলেন—না, না—সুকুমার! সে ভাল লাগে না, বড্ড চেঁচামেচি! তুমি তার চেয়ে কাল্‌কের মত দু'চারটা ভাল ভাল বাছাই-করা মহাজনী পদ শোনাও।

সুকুমার তর্ক করিতে চাহিল না, গাড়ী গ্যারেজে রাখিয়া আসিল।...

তারপর কর্ত্তা-গৃহিণীর সম্মুখে, হারমোনিয়ম লইয়া বলিল—কি গাইবো?

কর্ত্তা বলিলেন—মহাজনী পদ,—বাছাই-করা কীর্ত্তন গাও সুকুমার! গোবিন্দদাসের চীৎকার শুনে কাণে তালা লেগে গেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার সুকণ্ঠ-স্বর অট্টালিকার দিকে দিকে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—

"মাধব সো অব সুন্দরী বালা"...



পীড়িত সুকুমারের সেবায় স্বামীসহ বিজয়া।

বহুক্ষণ কীর্ত্তন গাহিয়া গৃহস্বামীর মনোরঞ্জন করিয়া, সুকুমার আহারার্থে বাড়ীর মধ্যে গমন করিল।

আহারে বসিল সে আর নির্ম্মল।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা দাদা! আমি কি আপনার মত গাইতে শিখতে পারবো না?

—"কে বোল্লে পারবে না?" সুকুমার তাহার প্রতি চাহিল।

বিজয়া বলিল—দাদা বলে—আমি কিচ্ছু শিখতে পারি না; আমার মাথায় নাকি গোবর পুরা আছে। আপনি শেখালে, ঠিক আপনার মত না পারলেও, কিছু ত পারবোই।…হ্যাঁ দাদা, পারবো না?

সুকুমার তাহার স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ-মধুর হাসি হাসিল; বলিল—আচ্ছা আমার পরীক্ষাটা হোয়ে যাক্, তারপর তোমাকে শেখাবো।

বিজয়া বলিল—সে ত এখনো ঢের দেরী আছে, ততদিন একটু একটু শেখান্ না দাদা!…স্বরে যেন কতই মিনতি ভরা!…

সুকুমার আহার করিতে করিতে মুখ না তুলিয়াই বলিল—আচ্ছা ফি রবিবারের দুপুরে, তোমায় একটু একটু শেখাব বিজয়া!—মাসে চার দিন কোরে। তা হোলেই তুমি শিখে ফেলবে! পারবে না?…নিমু যাই বলুক, সে ঠাট্টা করে। আমি তোমাকে রাগ রাগিণী পর্য্যন্ত শিখিয়ে দেব।

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—আর ব্যারিষ্টার সাহেব তোমায় আঁজলা ভরে বক্সীস কোরবেন।

বিজয়া অত্যন্ত রাগিয়া বলিল—বেশ বেশ যাও! সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না!…দাদা নাকি বোনের কাছ থেকে বক্সীস নেয়? ভা-রি আমার বুদ্ধি, উনি আবার আমাকে বলেন 'বোকা'!

মাতা ও সুকুমার হাসিতে লাগিলেন।

সুকুমার শুনিয়াছিল—এক ধনবানের কৃতবিদ্য পুত্রের সহিত বিজয়া বিবাহ স্থির আছে। পাত্রটী বিলাত গিয়াছেন—ব্যারিষ্টারি পরীক্ষ দিতে। এই মাসেই ফিরিবেন। কন্যাটীকে একবার দেখিয়া পছন্দ হইলেই বিবাহ হইবে। পছন্দ যে হইবেই, সে বিষয়ে কন্যাপক্ষ নিশ্চিন্ত। কেননা, বিজয়া স্নিগ্ধ-লাবণ্যবতী—উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী সুন্দরী। তার উপর রাধারমণ, মেম রাখিয়া কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিয়াছেন।···

আহারান্তে সুকুমার চলিয়া গেল, নির্ম্মল মাতাকে বলিল—আচ্ছা, যদি সুকুমারদা'র সঙ্গে বিজুর বিয়ে হয়, সে কেমন হয় মা?

মাতা বলিলেন—মন্দ হয় না, খুবই ভাল হয়। সুকুমারের মত ছেলে হাজারে একটা মেলে। তবে অনেক দিন থেকে সম্বন্ধটা ঠিক রয়েচে কিনা,—সবই পাকাপাকি, কেবল জামাই ফিরে এলে দু'হাত এক হ'তে যা বাকী।

ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া নির্ম্মল বলিল—তবে তো আসলেই গণ্ডগোল, জামাই আস্‌বে, তবে···

[ ৭ ]

## অনুতপ্ত

রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা। সুকুমার গীতান্তে ফিরিতেছিল। হারমোনিয়মের উপর সুদৃশ্য কাচের ফুলদানিতে একটি ছোট গোলাপের তোড়া বাঁধা রহিয়াছে। "কি সুন্দর ফুলগুলি" বলিয়া সে তোড়াটী উঠাইয়া লইল।

নির্ম্মল বলিল—নিয়ে যাও না, কাল ত শুকিয়েই যাবে।

সুকুমার ফুলগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন দেখিল, সেই ফুলদানিতে আজও একটি তোড়া বাঁধা রহিয়াছে। সুকুমার বলিল—আমাদের ভগবান মালীর এত বিদ্যে তা তো জানতাম না। তোড়া বাঁধে কি সুন্দর!

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল—ভগা বাঁধে বুঝি? তবেই হয়েচে! এ যে বিজু...

সুকুমার বলিল—ও, তাইত ভাবচি, এমন মানানসই করে সে কি সাজাতে পারবে? তার রুচিই বা কতটুক?

সেদিন যাইবার সময় বিজয়াই স্বহস্তে ফুলগুলি তুলিয়া দিয়া বলিল—ফুল আপনি এত ভাল বাসেন দাদা, তাত জানতাম না। নিন না এটা।

সুকুমার মুগ্ধের মত তাহার হস্ত হইতে পুষ্পগুচ্ছ গ্রহণ করিল ও স্খলিত পদে নিজ গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। তাহার বুকের মাঝখানটা যেন কিসের অজ্ঞাত পুলক-স্পর্শে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

অসুখ করিয়াছে বলিয়া, পরদিন সে গান শুনাইতে গেল না। অন্য-মনস্কভাবে নিজ শয্যায় পড়িয়া রহিল।

গৃহ অন্ধকার। আলো জ্বলিতেছিল, কিন্তু বিরক্ত বোধ হওয়ায় সে আলো নিভাইয়া দিয়া, একান্ত অলস—আচ্ছন্নের মতই শুইয়া পড়িল।

অতি কোমল পদশব্দ কাণে আসিতেই, সে চাহিয়া দেখিল একটি জ্বলন্ত বাতি হস্তে বিজয়া প্রবেশ করিল। তাহার অপর হস্তে একটি ফুলের গুচ্ছ। মৃদুস্বরে বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল—দাদা! আপনার অসুখ করেছে?

সুকুমার চমকিয়া উঠিয়া বসিল; তারপর হঠাৎ মনোভাব চাপিয়া রাখিয়া বলিল—তুমি এলে কেন বিজয়া? যাও—যাও—বাড়ীর মধ্যে যাও। বড় অন্যায় করেছ—এখানে এসে···

বিজয়া বিহ্বল-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সুকুমারের কথা সে বুঝিতে পারিল না। সুকুমার পুনরায় বলিল—রাত্রে···অন্ধকারে কেন এলে তুমি বিজয়া? আমি কাল সকালে গেলেই ত জিজ্ঞেস কোরতে পারতে—কী হয়েচে আমার।

বিজয়া জড়িত-স্বরে বলিল—আপনি গেলেন না, দাদা বোলে আপনার অসুখ করেচে, তাই দেখতে এলাম। সুকুমার স্নিগ্ধ-বিস্ময়ে মুহূর্ত্তমাত্র বিজয়ার মুখপানে চাহিয়া রহিল, তারপর একটা গোপন দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিল—তা জানি, তবু কেন এলে তুমি? বলিতে বলিতে যেন ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

বিজয়া ভয় পাইয়া বলিল—যাচ্ছি, কাল কিন্তু খুব সকালে যাবেন। নইলে আমি আবার আসবো। বলিয়া হস্তস্থিত পুষ্পগুচ্ছ তাহার

শয্যায় রাখিয়া, যেমন আসিয়াছিল তেমনি মৃদু-কুণ্ঠিত পদে ফিরিয়া গেল।

শত চিন্তার, শত শত আশা-নিরাশা উদ্বেগের আক্রমণে জর্জ্জরিত সুকুমার বিজয়ার পরিত্যক্ত পুষ্পগুচ্ছ সস্নেহে আপন হস্তে উঠাইয়া লইল। শুভ্র সুন্দর কামিনী-পুষ্পের গুচ্ছ! বালিকা বিজয়ার অতি যত্নে গ্রথিত! তার সুগন্ধে ক্ষুদ্র কক্ষের বায়ু যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পুষ্প-গুচ্ছের প্রতি চাহিয়া সুকুমারের বক্ষ বেদনায় ভরিয়া গেল! ভাবিল—হায়! কী দুর্ভাগা আমি!…বিজয়া! বিজয়া! আজ যদি জান্‌তে বিজয়া!—জান্‌তে যদি আমার নিগূঢ় জীবন-কাহিনীর সকল বৃত্তান্ত, তাহ'লে নিতান্ত অবুঝের মত এ অভাগাকে এত ভালবাসতে না!…স্নেহ, শুধু স্নেহ, পবিত্র ভ্রাতৃস্নেহ দিলে না কেন? যা আমি অনায়াসে গ্রহণ কোরে কৃতার্থ হ'তাম! কিন্তু ভগ্নি! আমি যে অভাগা। তোমার এ মহাদান—এ বিপুল নিবেদন—এ যে আমি নিতে পারি না!…অসম্ভব যে এ! এ ভাব কেন তোমার মনে এলো? এই পুষ্প-গুচ্ছের মত নির্ম্মল স্নিগ্ধ পবিত্র তুমি! তাই তুমি থাক বিজয়া! তাই থাকো তুমি! —আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি।

সুকুমার ভাবিতে বসিল—কেন এমন হয়!…হে সৃষ্টিকর্ত্তা! দীন অন্তরে কেন তুমি লালসার বীজ ছড়িয়ে দাও! এই নির্দ্দোষ অতি পবিত্র বালিকা, একে তুমিই শান্তি দাও ঠাকুর! আমি যে পাষাণ! স্নেহ-ভাল-বাসা-মমতা কিছুই নাই!—আমার শূন্য এ-কঠোর অন্তর—অনুর্ব্বর মরুভূর মত! তবু আমাকে কেনই বা লোকে ভালবাসে!

নির্জ্জন গৃহে ভাবনার জাল বুনিয়া বুনিয়া সুকুমার হাঁপাইয়া উঠিল!

দ্বার খুলিয়া সে বাগানে নামিয়া আসিল। অনেকক্ষণ বেড়াইল। সোপান-প্রান্তে কামিনী-পুষ্পের বিকশিত ঝাড়, পুষ্পরাশির শুভ্র শোভায় আনমনা সুকুমার, মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট দাঁড়াইল। বুঝিল—যাইবার সময় এই বৃক্ষ হইতেই বিজয়া পুষ্প-গুচ্ছ সংগ্রহ করিয়াছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুকুমার গৃহে ফিরিয়া গেল।—আজ যেন তার সমস্ত আশা-ভরসা প্রবল নৈরাশ্যের দুয়ারে কাঁদিয়া ফিরিতেছে!...

* * সকালে নির্ম্মল আসিয়া ডাকিল—দাদা! সুকুমার দা!—এখনো ওঠো নি যে?

বিনিদ্র সুকুমার স্নেহের আহ্বানে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। নির্ম্মল তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল—এক রাত্রে তোমার কী চেহারা হয়েচে দাদা! বড্ড অসুখ করেছে বুঝি?

—"পাগল!—কি আবার হবে—কিচ্ছু না"—বলিয়া সুকুমার মৃদু হাসিল। তারপর বলিল—বাড়ী যাও নিমু! আমি চান ক'রেই যাচ্ছি।

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল—এত সকালেই চান কোরবে কেন?

সুকুমার তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল—রাত্রে কেমন ঘুম হোলো না। একেবারে চান ক'রে পড়তে বসা যাবে। তুমিও এস শীগ্গীর—বলিয়া স্বীয় মস্তকের কুঞ্চিত কেশে তৈল ঘর্ষণ করিতে লাগিল।... নির্ম্মল চলিয়া গেলে, সেও স্নানের জন্য নীচে নামিয়া গেল।......

...আহারের সময় সুকুমার ইতস্ততঃ চাহিয়া, বিজয়াকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—বিজু কোথা মা? তাকে দেখছি না যে! কাল রাত্রে, বিন্দুকে সঙ্গে ক'রে আমায় দেখতে গিয়েছিল। আজ কোথায় গেল?

মাতা বিস্মিত দৃষ্টিতে সুকুমারের সুন্দর দেহের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ভাবিলেন—সে কি! মেয়ে আমায় না বোলে—না জিজ্ঞেস ক'রে, রাত্রে একা সুকুমারকে দেখতে গেল! এতো ভাল কথা নয়। এ সব কি হচ্ছে?…মাতা উত্তর দিলেন না দেখিয়া, নির্ম্মল বলিল—আজ যে তাকে প্রভাস দেখ্‌তে আসবেন। তাই তো রেগে কোথায় লুকিয়ে রয়েচে।

সুকুমার হাসিয়া বলিল—তাতে রাগ আবার কেন? দেখ্‌তে আসবে—এতো জানা কথাই।

নির্ম্মল বলিল—কেন রাগ তা সেই জানে। তাকেই জিজ্ঞেস কোরো। …বৈকালে কলেজ প্রত্যাগত সুকুমার শুনিল—প্রভাসচন্দ্র মল্লিক, বার-অ্যাট্-ল মহাশয়কে এখনি মোটর লইয়া আনিতে যাইতে হইবে। পাঠ্য পুস্তকগুলি গৃহে ফেলিয়াই সে সত্বর মোটর লইয়া মল্লিক মহাশয়ের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। মল্লিক সাহেব প্রস্তুত ছিলেন না। সুকুমারকে মোটরসহ সমাগত দেখিয়া বলিলেন—আমি এখনো তৈরী হ'তে পারি নি। আপনি একটু বসুন, আমি কাপড় ছেড়ে আসি।

সুকুমার এই ভদ্র লোকটীকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল। সে দেখিল—এই যুবার বদনে সহৃদয়তা, সচ্চরিত্রতা, বুদ্ধিমত্তা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজ করিতেছে!…শীঘ্রই প্রভাসবাবু প্রস্তুত হইয়া আসিলেন,—কিন্তু সাহেবি পোষাকে নহে। হ্যাট্, কোট্, নেক্‌টাই কিছুই নাই—দিব্য কোঁচানো সিম্‌লার নরুণ-পাড় ধুতির উপর সাদা গরদের পাঞ্জাবি, তদুপরি সূক্ষ্ম উড়ানি ফুর ফুর করিয়া উড়িতেছে। পদে হরিণ-চর্ম্মের সাদা পাম্প্ সু, হস্তে সুবর্ণমণ্ডিত সুদৃশ্য ছড়ি। তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন—সে কি! তখন থেকে আপনি দাঁড়িয়ে রয়েচেন? চলুন! চলুন!…

যথাসময়ে গাড়ী-বারান্দায় মোটর আসিয়া থামিতেই, রাধারমণ সেন মহাশয় কৃতবিদ্য বন্ধুপুত্র ও ভাবী জামাতাকে পরম আদরে বৃহৎ কক্ষে লইয়া বসাইলেন, এবং সুকুমারকে বলিলেন—সুকুমার! বাড়ীতে খবর দাও ত বাবা! বলো—প্রভাস এসেচেন, বিজুকে এখনি একবার দেখবেন।

সুকুমারের বক্ষে কে যেন সবলে হাতুড়ির আঘাত করিল। মনে মনে বলিল—বিজয়া যেন এ বিবাহে সুখী হয়,—নারায়ণ! তাকে সুখী কোরো ঠাকুর!···মুহূর্ত্তমাত্র আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া, প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে বাড়ীর মধ্যে গমন করিল। দেখিল—দ্বিতলের প্রশস্ত দালানে, গৃহিণী কন্যাকে সাজাইতেছেন, কিন্তু বিজয়া আব্‌দার জুড়িয়া বসিয়াছে, সে কাহারো সাক্ষাতে যাইতে পারিবে না। বিবাহে তাহার প্রয়োজন নাই। মাতা রাগিয়া, বকিয়া, কাঁদিয়া মহা অনর্থ বাধাইয়া তুলিয়াছেন। বিজয়াও মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কেবলই কাঁদিতেছে।

সুকুমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে বলিল—বিজয়া, এ সব কি পাগলামি করছো তুমি? চোখ-মুখ ফুলে উঠলো যে! ভদ্রলোক বাড়ী এসেচেন, তাঁকে কি কিছু বলা যায় এখন?··· বিয়ে কোরবে না সে আবার কি কথা? শান্ত হও, মা যা বোলছেন তাই কর। নীচে বাবা তাড়াতাড়ি কোরছেন।

গৃহিণী বলিলেন—দেখ ত বাবা সুকুমার! হতভাগা মেয়ে শুনে অবধি কান্না ধরেচে। কি চেহারাই হোলো দেখ ত একবার!

সুকুমার ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—বিজয়া! লক্ষ্মী বোন্‌টি!—শান্ত হও! ছি! ও রকম ক'রতে আছে?

বিজয়া তাহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু তুলিয়া সুকুমারের প্রতি চাহিল। তারপর আর কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বেশ-বিন্যাসে মনঃসংযোগ করিল।

সুকুমার ও নির্ম্মল ব্যারিষ্টার প্রভাসচন্দ্রের সম্মুখে বিজয়াকে আনিয়া দেখাইল। তাহার অনুপম যৌবন-শ্রীমণ্ডিত অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া ব্যারিষ্টার-প্রবর সেই দিনই বিবাহে সম্মতি দিয়া গেলেন। তখন কার্ত্তিক-মাস, আগামী অগ্রহায়ণেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল, এবং পরদিন হইতেই মহা সমারোহে আয়োজন চলিতে লাগিল।

বিজয়া একদিন সুকুমারকে ধরিয়া বলিল—দাদা! এই ক'দিনে বেশ ভাল ক'রে আমায় খানকতক গান শিখিয়ে দেবেন? এরপর তো আর শিখতে পাবো না—যতদিন বাঁচবো—চিরদিনই তাই মনে কোরে রাখবো।

সুকুমার তাহাকে কিছু বলিতে চাহিল। কিন্তু কি সে বলিবে! অভাগী বালিকাকে আজ কি বলিয়া বুঝাইবে? কি তাহার শ্রুতিসুখকর হইবে—কে জানে!

সুকুমার—ক্ষুব্ধভাবে মাথা নত করিল।—বলিবার সহস্র কথা অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া গিয়াছে।—কিন্তু মুখ আজ বাক্‌শক্তি-হারা!…হায়রে… তার উচিত-পাওনার সমারোহ!……

[ ৮ ]

## পলায়ন

নির্ম্মলের অসুখ করিয়াছিল। সুকুমারকে ব্রজ আসিয়া বলিল—সুকুমারবাবু, দাদাবাবু আপনাকে রাত্রে তাঁর কাছে শুতে বোল্লেন।

সুকুমার বলিল—কেন বিজয়া—মা এঁরা নেই?

ব্রজ বলিল—তিনি খালি আপনাকেই চাচ্ছেন। বল্‌লেন—দাদাকে না পেলে আমি ঘুমুতে পারবো না। মা বল্‌লেন—সুকুর শরীর খারাপ, তাকে শুদ্ধ রাত জাগিয়ে লাভ কি? আমরা তো র'য়েছি। কিন্তু—দাদাবাবু তা শোনেন না, হুকুম করলেন—সুকুমারদা'কে এক্ষুনি ডেকে আন্ বেজা!—এক্ষুনি যেন আসেন।...

সুকুমার, নির্ম্মলের সাদর আহ্বান ঠেলিতে না পারিয়া, এবং মনে মনে এই বিপুল স্নেহের জন্য পুলকিত হইয়া, রোগীর শুশ্রূষার নিমিত্ত ভিতর-বাড়ীতে চলিল। কিছুদূর গিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল—প্রায়ান্ধকার দালানে কর্ত্তা-গৃহিণী মর্ম্মর কক্ষতলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহারা কোনও বিষয়ে বচসা করিতেছিলেন। কিন্তু ঐই মৃদু আলাপনের মধ্যে নিজ নাম শুনিয়া সে একান্ত অনিচ্ছায় সেই গৃহের সম্মুখেই থামিয়া পড়িল। শুনিতে পাইল—গৃহিণী উত্তেজিতভাবে বলিতেছেন—"কেন, হবে না কেন?"

কর্ত্তা বলিলেন—"সুকুমারও সেন, আমরাও সেন। সুতরাং এক গোত্র। সমান গোত্রে বিয়ে হয় কখনো?"

গৃহিণী বলিলেন—"হয় না যদি জানতে, তবে কেন সুকুমারকে এনে মেয়ের চোখের সাম্‌নে ধর্‌লে ? মেয়ে যে আর কাকেও বিয়ে কোরবে না বোলে বেঁকে বোসেচে।"

কর্ত্তা সবিস্ময়ে বলিলেন—"সে কি ? সুকুমার ত তেমন ছেলে নয়, তার স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল বোলেই তো ওকে বাড়ীর মধ্যে আস্‌তে বাধা দিতাম না।"

গৃহিণী বলিলেন—"তার চরিত্র মন্দ তা কি আমি বোলচি ? ভাল বোলেই ত মেয়ে ওকে চাচ্ছে।"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন—"ও তোমার বোঝ্‌বার ভুল।"

গৃহিণী বলিলেন—"তা তো এখন বোলবেই। রাত্রে লুকিয়ে সুকুমারকে দেখতে যাওয়া, একদণ্ড না দেখলে চোখে অন্ধকার দেখা, সবই আমার বোঝ্‌বার ভুল। সেদিন প্রভাস দেখতে এলো—তাতে মেয়ের কি কান্না ! কিছুতেই তার সাম্‌নে যাবে না। যাই সুকুমার এসে বোঝালে, অমনি মেয়ে চল্‌লো। সুকুমারের কথায় এমন কোরে মরে-বাঁচে—কেন ?"

কর্ত্তা বলিলেন—"তা যদি বুঝেছিলে তুমি, তবে এতদিন সে-কথা আমায় বল নি কেন ?"

গৃহিণী দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"আমি ভেবেছিলাম, সুকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যাবে। ওর সঙ্গে যে হবে না, হ'তে পারে না—তা কি আমি জান্‌তাম ?..."

সুকুমার ভাবিল—আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে ! ধূমকেতুর মতই একদিন সে এই সুখী পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ! আজ অমঙ্গলের সূচনা আঁকিয়া দিয়া তাহাকে কোথায় যাইতে হইবে—কি

করিতে হইবে—কে জানে! সে আর শুনিবার অপেক্ষা করিল না। যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া গেল।

নিজ অধিকৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া বজ্রাহতবৎ আপন শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। ভাবিল—এ কি হইল? নারায়ণ, এ কি করিলে? কি হইতে কি হইল, কেন আমি এখানে আসিলাম? কেন ইহাদের সঙ্গে এত আত্মীয়তা করিলাম? কেন ইহারা আমাকে এত ভালবাসিল? কী আছে আমার? দীন দরিদ্র অন্নহীন আমি, ইহাদের বেতনভোগী ভৃত্যমাত্র। হৃদয়হীন পাষাণ আমি, তবুও ইহাদের যে আমি স্নেহ করি! কিন্তু কেন করি, তাহা কোনও দিন ঘুণাক্ষরেও জানাই নাই! নিজ হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া সুকুমার বিস্মিত হইল!—বিজয়াকে ভালবাসি! কিন্তু সে কি প্রেম—? না, না, ছি! ছি!—বিজয়া যে ভগিনী!···স্নেহময়ী!···বিজয়া! বিজয়া! অযোগ্যকে,—এ তুচ্ছ অপদার্থ পাষাণকে আজ—কেন এ লজ্জায় ফেললে তুমি? আমায় ভুলে যাও বিজয়া—ভুলে যেও! প্রভাসচন্দ্রই তোমার উপযুক্ত। সে সৎ, ধনী, রূপবান্। আমি আশীর্ব্বাদ করি—তুমি তুচ্ছজনের কথা ভুলে যাবে। এই কলঙ্কের গ্লানি তোমার পবিত্র হৃদয় থেকে মুছে ফেলে, সংসারে সুপত্নী হয়ে সুখী হবে।

সুকুমার বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, পরে উঠিয়া গৃহমধ্যে অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে বাহির হইয়া সে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহাতে চাবি দিল। চাবিটী সেই তালার গায়েই ঝুলিতে লাগিল। সুকুমার সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল। স্তব্ধ নিশীথে অষ্টমীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে সে নিদ্রিত অট্টালিকার প্রতি চাহিল। উচ্ছ্বসিত অশ্রু-স্রোত বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া ফেলিয়া, পশ্চাৎ ফিরিল। তারপর দ্রুত

পাদক্ষেপে বাহির হইয়া রাজপথে পড়িল। দ্বারবান্ হরিকিষন্ সিং তখন দিব্য আরামে নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা দিতেছিল। সুতরাং এই গৃহত্যাগের বিবরণ কেহ জানিল না।......

উদ্‌ভ্রান্ত সুকুমার রাজপথ বাহিয়া স্খলিত গতিতে চিৎপুর রোডে এক বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইল। দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—"শশধর দাদা!" পরক্ষণেই নীচের একটী কক্ষে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিয়া উঠিল ও দ্বার খুলিয়া এক কৃশকায় গৌরবর্ণ যুবা-পুরুষ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার নগ্ন স্কন্ধে শুভ্র উপবীত ঝুলিতেছে। নিদ্রালস চক্ষু দুটি রগড়াইয়া, সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—সুকু! এত রাত্রে কোথা থেকে? এস এস ভেতরে এস। বলিয়া সুকুমারের হস্ত ধরিল। যন্ত্র-চালিতের মত তাহার আকর্ষণে সুকুমার গৃহে প্রবেশ করিল।

সম্মুখের শয্যায় শশধর তাহাকে বসাইয়া দিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল—কোথায় ছিলে এতদিন? এত রাত্রে এলে কোথা থেকে"?

সুকুমার বলিল—ছিলাম এই কলকাতাতেই,—রাধারমণ সেনের বাড়ী। এখন পালিয়ে এলাম।...মা কোথায়, শশধর দা? শশধর বলিল—মা সেই তোমায় না পেয়ে অবধি কেঁদে কেঁদে পাগলের মতন হ'লেন। মাসখানেক হোলো কাশী গেছেন। আমিও সেইখানে ছিলাম।

সুকুমার কিছুই শুনিল না, বুঝিল না। বোধ হয় শুনিবার বা বুঝিবার মত তাহার চিত্তের অবস্থা ছিল না। বলিল—আমার কতকগুলো টাকা তোমার কাছে ছিল না, দাদা?

শশধর বলিল—সাড়ে তিন শ' টাকা তোমার স্কলারশিপের দরুণ আমার কাছে মজুত আছে।

সুকুমার সাগ্রহে বলিল—আমায় দেবে ?

শশধর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখনি কি হবে নিয়ে ?

সুকুমার ব্যগ্রভাবে বলিল—এখনি আমি চাই ! দরকার আছে। আমি মার কাছে যাব শশধর দাদা !

শশধর আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না। গ্লাস-কেস্ খুলিয়া, সাড়ে তিন শত টাকা বাহির করিয়া দিল। সুকুমার অবনত হইয়া তাহার পদধূলি লইয়া বলিল—শশধর দা, আশীর্ব্বাদ কর এইবার যেন শান্তি পাই !

শশধর তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল, বলিল,—সুকু, ভাই ! এত রাত্রে কোথায় যাবে তুমি ? আমি তোমায় তো যেতে দেব না। কাল রাত্রের গাড়ীতে দুই ভাই একসঙ্গে মার কাছে যাবো।

সুকুমার তাহার বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বলিল—না দাদা, আমাকে বাধা দিও না। কাল যদি মার কাছে যাবার এই ইচ্ছা আর না থাকে ! আজই যে গাড়ী পাবো তাতেই কাশী রওনা হবো ! না পাই, ষ্টেশনে অপেক্ষা করবো—এ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য চিন্তা কিছুতেই মনে আন্‌তে দেব না।

শশধর আর তাহার গমনে বাধা দিল না।

[ ৯ ]

# প্রণয়ী

অশান্ত সুকুমার হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, বরাবর বেনারসের টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। রেলে উঠিয়া সে সেকেণ্ড-ক্লাস কামরায় বেঞ্চের উপর হাতে মস্তক দিয়া শুইয়া পড়িল, গাড়ীতে একটী মধ্য-বয়স্ক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ পরে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কোথায় যাবেন?

সুকুমার চক্ষু চাহিল, বলিল—কাশী যাবো।

লোকটী তাহাকে স্বদেশী ডাকাত কি এমনি কিছু মনে করিয়া, আর কথা কহিলেন না বটে, কিন্তু এই এক-বস্ত্র কৃশকায় যুবার প্রতি বহুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

সুকুমার তখন ভাবিতেছিল—কাশী যাইতেছি মার কাছে—মাতৃচরণ-সন্দর্শনে। কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে আমাকে—কাহার কাছে যাইবে, কোথায় থাকিবে, কে তোমার মা, কোথায় তিনি? কিন্তু আমি কি সত্য কথা বলিতে পারিব?—না না, তা তো পারিব না। এখনও জিহ্বায় জড়তা আছে। মাথা লজ্জায় নুইয়া পড়ে। সে কথা যে ভাবিতেই পারি না,—তা বলিব কি করিয়া? নারায়ণ! কোন্ পাপে এ শাস্তি—এ যন্ত্রণা?...যাইব না—আমি পরিচিত কাহারও কাছে যাইব না। একা—আমি জগতে একা, আমার কেহ নাই—কেউ নাই!

বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে উঠিয়া বসিল। ভদ্রলোকটি তখনও

চাহিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া, সে প্রতি-প্রশ্ন করিল—মশাই কোথায় যাবেন ?

ভদ্রলোক বলিলেন—আমি দিল্লী যাবো। সেইখানেই চাকরী করি।

সুকুমার বলিল—আপনার নামটি জিজ্ঞেস্ করতে পারি কি ?

ভদ্রলোক বলিলেন—আমার নাম সুরনাথ বসু। আমি দিল্লীতে মাষ্টারী করি।

সুকুমার বলিল—আপনিই বিখ্যাত গণিতবিদ্ সুরনাথ বসু ? আমি নাম আপনার জানতাম। চাক্ষুষ হয়নি কখনো। বড় সুখী হলাম আজ আপনার দেখা পেয়ে।

সুরনাথ বলিলেন—আপনার কি করা হয় ?

—"আমার ?" বলিয়া সুকুমার হাসিল, তারপর বলিল—আমি সেণ্ট্ জেভিয়ারে এম্-এ পড়ি। কলকাতায় থাকবার ইচ্ছা নেই। আপনার কলেজে আমাকে ট্রান্স্ফার করিয়ে নিতে পারেন ?

সুরনাথ বসু বলিলেন—পারবো ব'ই কি! কিন্তু—এই পরীক্ষাটা দিয়েই না হয় যেতেন! তাতে আপনারই সুবিধা হ'ত।

সুকুমার বলিল—আজ্ঞে না, তাহ'লে হয়ত আর আমার পরীক্ষাই দেওয়া হবে না।

সুরনাথ বসু বলিলেন—তা দেখবো চেষ্টা ক'রে, আপনার কোন্ কোর্স ?···সুকুমার যাহা বলিল, তাহাতে এই অধ্যাপক মহাশয় সুখী হইয়া বলিলেন—পারবো হয়ত, হ্যারিস্ সাহেব লোক ভাল।

সুকুমার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া বসিল—চলুন, আপনার সঙ্গে দিল্লীই যাই।

সুরনাথ বসু বলিলেন—এই যে বোল্লেন কাশী যাচ্ছেন?

সুকুমার বলিল—সেখানে বিশেষ কিছু দরকার নেই, কেবল চেঞ্জ্ করা, তা দিল্লীতেই সেটা করা যাবে। কি বলেন?

সুরনাথ বসু এই খাম-খেয়ালী প্রিয়দর্শন যুবকটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কথা কহিলেন না।

যথাসময়ে তাঁহারা দিল্লী পৌছিলেন। সুরনাথ বসু সুকুমারকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহার পত্নী, পুত্র-কন্যা সকলেই অতি আত্মীয়তার সহিত সুকুমারকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

সুরনাথ বসুর পিতা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী প্রচারক ছিলেন। সুরনাথ তাঁহার এক মাত্র সন্তান। তিনি অতি ধীর, ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্ম। তাঁহার পত্নীও কোনও বিখ্যাত ব্রাহ্ম-পরিবারের কন্যা। সুরনাথ বসুর পুত্র কন্যা অনেকগুলি। কলিকাতায় কোনও বড় কলেজে প্রফেসারি করিতেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা মলিনা বেথুনে পড়িত। যখন মলিনা আই, এ, পড়িতে থাকে, সেই সময়ে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। ডাক্তার ক্ষয়-কাসের আশঙ্কা করায়, ও সেই সময় এই দিল্লীর কলেজে অধিক বেতনে চাকুরী হওয়ায়, সুরনাথ কলিকাতা হইতে সপরিবারে দিল্লী চলিয়া আসেন। সে দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা। কন্যাটী এখন অত্যন্ত পীড়িতা, প্রায় শয্যাগতা। জীবনের আশা পিতা-মাতা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহার জন্য তাঁহাদের সংসারের আনন্দ যেন চলিয়াই গিয়াছে। এই সর্ব্ব প্রথমকার সন্তান। সুন্দরী, গুণবতী ও সুশিক্ষিতা। পিতা-মাতা তাহার রোগে বড়ই মর্ম্মাহত।...সুকুমারকে, সুরনাথ বসু আপন প্রতিশ্রুতি মত কলিকাতা হইতে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। তিন

মাস পরে এম-এস্-সি পরীক্ষা দিয়া, সুকুমার চতুর্থ স্থান অধিকার করিল এবং সেই কলেজেই সায়েন্সের জুনিয়ার প্রফেসারি চাকুরী পাইয়া, তদবধি দিল্লীতেই বস-বাস করিতে লাগিল।...

তখন ফাল্গুন মাস। দিল্লীতে গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সুকুমার কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজ ক্ষুদ্র বাংলা-বাড়ীতে প্রবেশ করিল। পশ্চিমদেশীয় ভৃত্যটি ঘুমাইতেছিল। প্রভুর আগমনে উঠিয়া পড়িয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিল এবং হস্তপদ ধৌত করিবার জল দিল। ক্লান্ত সুকুমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে নীরবে বসিয়া রহিল। আজ কয়দিন তাহার শরীর ভাল ছিল না, জ্বর হইতেছিল, মস্তকে দারুণ যন্ত্রণা। দেহ ক্রমশঃ শক্তিহীন। তথাপি সুকুমার বেলা পড়িবার অপেক্ষা করিতেছিল।...

একটু বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকিবে। ঘুম ভাঙিলে শুনিল—পাঁচটা বাজিতেছে। সুকুমার উঠিয়া সম্মুখের দ্বার খুলিয়া ফেলিল। দেখিল—সূর্য্য তখন পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। তথাপি কিছু রৌদ্র বাংলার ক্ষুদ্র উদ্যানে ক্রীড়া করিতেছিল। এই ক্ষীণায়মান ম্লান সূর্য্যাভার প্রতি চাহিয়া সে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল—প্রকৃতি স্তব্ধ! ঝড় আসিবে না কি?—ভাবিয়া সুকুমার বাগানে গেল। শরীর অবসন্ন, মনে অনেক চিন্তা ছায়া-চিত্রের দৃশ্য-পটের মত আসিয়াই মিলাইয়া যাইতেছে। বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া, সুকুমার গুচ্ছবদ্ধ পুষ্প হস্তে করিয়া সুরনাথ বসুর গৃহাভিমুখে চলিল।... ফুলগুলির প্রতি চাহিয়া হাসি আসিল,—একজন বড় স্নেহে আমাকে ফুল দিতে আসিয়াছিল, হতভাগ্য আমি, তাই সে অমিয়মর স্নেহ-প্রীতি

আমার সহিল না ;—আমি দাগা খাইয়া এবং দাগা দিয়া, পলাইয়া আসিলাম ! আজ আবার সমস্ত চিত্ত এক হইয়া, এই ফুলগুলি আর এক-জনকে দিতে চাহিতেছি ; সেও—পলায়নোন্মুখ ! আমাদের ভালবাসা যতই গভীর অকৃত্রিম হোক্ না কেন, তাকে যে ধরিয়া রাখা অসাধ্য !···আজ তোমার একি রহস্য নারায়ণ ? একি নির্ম্মম করুণা ? যাকে দুঃখ দিবার জন্যই জগতে পাঠাইয়াছ, তার জন্য কি কণা মাত্রও শান্তি সুখ —তোমার বিশাল ভাণ্ডারের ক্ষুদ্র এক কোণেও সঞ্চিত রাখ নাই ? তবে কেন ? তবে—তবে আর কেন ? তবে আমায় দিয়ে তোমার এই বিশাল সৃষ্টির কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে ? ওগো নিঠুর নারায়ণ,—বড় দীন, বড় রিক্ত আমি ! তোমার অফুরন্ত করুণা দিয়ে, আজ আমার এ রিক্ততা পূর্ণ ক'রে দাও !—পূর্ণ কর—হে ভগবান্ !···

সুরনাথ বসুর বাংলার সম্মুখে উপনীত হইয়া দেখিল—সুরনাথ বাবুর শিশুপুত্র-কন্যাগুলি বাগানে খেলা করিতেছে। সুকুমারকে দেখিয়া তাহারা ছুটিয়া আসিল, কেহ জড়াইয়া ধরিল, কেহ হস্ত ধরিয়া টানিল, কেহ পা-তলায় ঝুলিতে লাগিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যেটী, সেটী পঞ্চদশ বর্ষীয় কিশোর। সে বলিল—"যা-যা—দাদাকে বিরক্ত ক'রিসনি। দাদা, আজ আপনার শরীর কেমন আছে ?" সুকুমার তাহার শাসনের ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—আমি তো ভালই আছি, কেন কি হয়েছে আমার ?···মলিন কেমন আছে আজ ?

বালক বলিল—আজ তাঁর বড় বুক ধরফড় কোরছে, বাবা ডাক্তার বালাপ্রসাদকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। আসুন না দেখবেন !

সুকুমার বিরুক্তি মাত্র না করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

মলিনার কক্ষে উপস্থিত হইতেই, সে তাহাকে দেখিয়া অতি সুকোমল মৃদু হাসিয়া হস্ত প্রসারণ করিল; সুকুমার ফুলগুলি তাহার হস্তে দিয়া ললাট স্পর্শে বুঝিল—আজ দিনমানেই জ্বর আসিয়াছে। তারপর নিকটে একখানি কাষ্ঠাসন টানিয়া লইয়া বসিতেই, মলিনা বলিল—বোসলেন যে! একটু বাইরে নিয়ে যাবেন না আজ?

সুকুমার তাহার পাণ্ডুর ললাট হইতে কেশগুচ্ছ সরাইতে সরাইতে বলিল—ডাক্তার এসে দেখুন, তারপর নিয়ে যাবো।

মলিনা ক্লিষ্টমুখে মৃদু হাসিল। বলিল—বাবা বুঝেও বোঝেন না, সুকুমার বাবু! আমি যে আর ভাল হব না, তা আমিও জানি, আপনারাও জানেন। আর ক'দিনই বা,—বোধ হয়—চারদিন। সম্ভবতঃ এই পূর্ণিমার দিন অবধি মেয়াদ আছে। সেই দিন যেতে হবে। দুঃখিত হচ্ছেন কি? কিন্তু উপায় নেই! আমারও যেতে ইচ্ছা হয় না সুকুমার বাবু! বলিতে বলিতে পদ্মপলাশ সদৃশ কোটরগত চক্ষু দিয়া সুকুমারের পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যথিত সুকুমার চাহিয়া চাহিয়া মনে করিল—এই মৃত্যুলোক-যাত্রী তরুণীর কি যেন একটা প্রার্থিত আছে, আর সে প্রার্থনা তাহারই কাছে।

সুকুমারের আর কিই-বা আছে মলিনা! যাহা সে তোমাকে নূতন করিয়া উপহার দিবে? তার পবিত্র হৃদয়ের অতি পবিত্র প্রীতি-ধারা, তা দিয়া অনবরত সে তো তোমাকে স্নান করাইয়া দিতেছে! ওগো অতৃপ্তা! ওগো ব্যথাহতা কুমারী! আর কী তুমি আকাঙ্ক্ষা কর? আর কী চাহ?

সুকুমার তাহাকে সযত্নে উঠাইয়া বাম হস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিল। অতি স্নেহে স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া বাগানে ইজিচেয়ারে বসাইয়া দিল। নিকটে একখানা কাষ্ঠাসন আনাইয়া নিজে বসিয়া তাহার নিকট নানাবিধ গল্প করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ডাক্তার আসিলেন, গৃহস্বামী সুরনাথ বসুও আসিলেন।

পরীক্ষান্তে ডাক্তার সুকুমারকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—বেশী নাড়াচাড়া আর করবেন না, মূর্চ্ছা হওয়ার সম্ভাবনা। তা ছাড়া সে মূর্চ্ছা ভাঙবে কি না তা-ও বলা কঠিন।

এই মর্ম্ম-ভেদী কথা শুনিয়া সুকুমার প্রস্তর-পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল—ঠিক যেন প্রাণহীন!……

* * * বেলা পড়িয়া ক্রমে রাত্রি হইল, দশমীর স্বচ্ছ জ্যোৎস্নালোকে উদ্যান, বৃক্ষ, লতা হাসিতে লাগিল! রজনীগন্ধা-হাসনাহানার মিশ্র গন্ধ মৃদু বায়ুযোগে সুকুমার ও মলিনাকে ঘিরিয়া বহিতে লাগিল। কখন যে তাহাদের বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গেছে—তাহা ভাবমুগ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকা জানিতেও পারে নাই! মলিনার অতিশীর্ণ হস্ত নিজ হস্তে লইয়া সুকুমার হাস্যময়ী প্রকৃতির এই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া রহিল।

……অনেক রাত্রে ভৃত্য আসিয়া বলিল—বাবু, খানা তৈয়ার, দিদি-মণিকো ভিতর লে চলিয়ে! সুকুমার সচেতন হইয়া বাংলায় বলিল—আমার দেহটা ভাল নেই, মাকে বল কিছুই খাব না। তারপর মলিনাকে বলিল—ঠাণ্ডা লাগবে মলিন, চল তোমায় ঘরে নিয়ে যাই।

মলিনা কোন আপত্তি করিল না; সুকুমারের দেহাবলম্বনে উঠিয়া

দাঁড়াইল। তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া, অতি মৃদুস্বরে বলিল—এখনও কি এই ঝাঁজ্‌রা দেহটায়, লাগবার ভয় আছে সুকুমার বাবু?

সুকুমার সখেদে বলিল—এইটুকুই যে বড় দুঃখ মলিন, নিজেদের প্রাণ দিয়েও আর তোমায় রাখ্‌তে পারবো না।

মলিনা মৃদু অথচ সস্নেহ স্বরে বলিল—দুঃখ কোরো না সুকুমার! যতদিন থাকৃতে হবে তা-ত আমরা ঠিক করেই এসেছি ভাই! এক দণ্ডও ত বেশী কম হবার যো নেই। তবে দুঃখ কি?

সুকুমারের অন্তর ভেদ করিয়া সুদীর্ঘ এক নিঃশ্বাস পড়িল।···মুখের কথা তখন আসন্ন বিরহাশঙ্কায় বন্ধ হইয়া গেছে!

[ ১০ ]

# সুখাবসান

রাত্রি তখন একটা। সুরনাথ বাবু পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বলিলেন—সুকুমার, একটু বিশ্রাম কর। আজ তিন রাত হল যে তোমার!

সুকুমার আপনার বিহ্বল দৃষ্টি তুলিয়া তাঁহার প্রতি চাহিল। অতি মৃদু কম্পিত স্বরে বলিল—আর ত বেশীক্ষণ বলবার নেই সুরনাথ বাবু, সব ত শেষ হয়েই যাচ্ছে।—তারপর চিরবিশ্রাম যে সুকুমারের!

সুরনাথ বাবু অতি ধীর ও সহিষ্ণু পুরুষ; তথাপি তাঁহার চক্ষের জল অসংবরণীয় হইয়া পড়িল। দুই চারি বিন্দু বোধ হয় সুকুমারের মস্তকেই ঝরিয়া পড়িয়া থাকিবে।

সুকুমার-চমকিত হইয়া বলিল—কাঁদ্‌চেন? আপনি কাঁদ্‌চেন সুরনাথ-বাবু…হা রে অন্তর! ··আজ আমিও যদি কাঁদতে পারতাম!

সুরনাথ বাবু বলিলেন—তাই কর, একটু কাঁদ তুমি সুকুমার! তোমার এই রোদনাতীত শোক, এ যে আমি সহ্য করতে পারছি না। কন্যার মৃত্যুর চেয়েও এ যে আমায় বেশী ব্যথা দিচ্ছে বাবা!

সুকুমার তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইল। কাঁদিল কি না তাহা সুরনাথ বাবু বুঝিতে পারিলেন না।

এমনি সময় রোগিণীর ঈষৎ চৈতন্য হইল। চক্ষু চাহিয়া বলিল—আঃ বাবা!···সুকুমার! বড় যন্ত্রণা যে—! সুকুমার তাহার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাতর-ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল—কি কষ্ট মলিন? কোথায় যন্ত্রণা আমায় বল?

মলিনা তাহার প্রতি চাহিল। চক্ষে তখন মৃত্যু-ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে, দৃষ্টি অস্থির অর্থহারা! তথাপি সে সুকুমারের হাতখানা লইয়া আপন বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল, বলিল—এইখানে, সুকুমার! এইখানে—বড় যাতনা—হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি যে!···আমাকে তুলে বসিয়ে দাও ত!

সুকুমার বলিল—না-না, তাতে কাজ নেই মলিন! তোমার দুর্ব্বল দেহ, সে পরিশ্রম তো সইতে পারবে না।

মলিনার অধর-প্রান্ত ঈষৎ ভিন্ন হইল—বোধ হয় হাসিবার চেষ্টায়। বলিল—আর কি দরকার সুকুমার? বড় যে কষ্ট! যা হয় হোয়ে যাক্! একটু তুলে দাও আমায়!

অন্তিম-শয্যাশায়িতার কাতরোক্তিতে অভিভূত সুকুমার তাহাকে তুলিয়া ধরিল, পিতা সুরনাথ বসু উপাধানটি তাহার নিম্নে সরাইয়া দিলেন। বার দুই হিক্কা তুলিয়া মলিনা চক্ষু মুদিল, পিতা তাহার প্রকোষ্ঠ ধারণ করিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি বলিলেন—সুকুমার—সুকুমার! পাশের ঘর থেকে ডাক্তারকে ডাকো একবার—!

সুকুমার শুনিয়াও শুনিল না, বোধ হয় শুনিতে পাইল না। সে সদ্য-মৃতার পাণ্ডুর মুখের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, সেই মৃত্যু-শীতল অধরোষ্ঠ চুম্বনে চুম্বনে ভরাইয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া বলিল—জীবনে যা তোমাকে

দিতে পারিনি, আজ তা নিয়ে যাও মলিন, নিয়ে যাও! অভাগা আমি—অপবিত্র আমি! তাই বোলে তুমিও যেন ঘৃণা কোরো না; অগ্রাহ্য কোরো না!

ডাক্তার পার্শ্বের কক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিলেন, তাহাকে টানিয়া তুলিয়া রোগিণীকে পরীক্ষান্তে বলিলেন—সব শেষ হ'য়ে গেছে।

মলিনার মাতার ও শিশু-ভ্রাতা-ভগিনীগণের করুণ রোদনে গৃহ-কক্ষ পূর্ণ হইয়া গেল।......

রাত্রিশেষে কলেজ-বোর্ডিংয়ের ক'একটী ছাত্র আসিয়া সময়োচিত ব্যবস্থাদি করিয়া শব উত্তোলন করিল। সেই সময় কতকগুলি শুভ্র পুষ্প হস্তে সুকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল। এতক্ষণ সে কোথায় ছিল কেহ লক্ষ্য করে নাই। ফুলগুলি সে মলিনার মৃত-দেহের উপর বর্ষণ করিয়া, যে পালঙ্কে ছাত্রেরা মৃতদেহ বাহির করিয়াছিল, তাহার একপ্রান্ত ধারণ করিল! সকলেই সুকুমারকে চিনিত। কোন বাক্যব্যয় মাত্র না করিয়া শব-বাহী ছাত্রদল নীরবে শ্মশানঘাটের দিকে অগ্রসর হইল।.....

* * * সৎকারান্তে ফিরিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেছে।

সুরনাথ বাবু সুকুমারকে বলিলেন—সুকুমার! বাবা! আজ আর একা তোমার বাসায় গিয়ে কাজ নেই।

সুকুমার শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, উত্তর দিল না। সুরনাথ তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে কক্ষমধ্যে লইয়া গেলেন।

সুকুমারকে দেখিয়া মলিনার জননী বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুকুমার মৃদুস্বরে বলিল—কাঁদবেন না, মা। সে যেখানেই

গিয়ে থাক্, শান্তি পাক্! বড় যে কষ্ট পেয়ে গেল, তার তা' আবার ইচ্ছেই ছিল না, সে যে বড় আশায় বাঁচতে চেয়েছিল।...উভয়হস্তে মস্তক চাপিয়া ধরিয়া সুকুমার, মলিনা যে-গৃহে দেহত্যাগ করিয়াছিল—সেই গৃহের একখানা কাষ্ঠাসনে বসিয়া রহিল।

আহারীয় প্রস্তুত হইলে, মলিনার শিশু-ভ্রাতাটী তাহাকে ডাকিতে আসিলে সুকুমার সুপ্তোত্থিতের মত মুখ তুলিয়া বলিল—আমার বড় জ্বর হয়েচে ভাই, আমি ত' কিছু খাব না।

বালক এই কথা পিতা-মাতাকে জানাইল।

আহারান্তে আসিয়া সুরনাথ বাবু দেখিলেন—অত্যধিক জ্বরে সুকুমার তখন লুপ্ত-চৈতন্য। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইলেন। আবার চিকিৎসার আয়োজন সুরু হইল। কিন্তু মাসাবধি পরে, চিকিৎসকগণ একবাক্যে মত প্রকাশ করিলেন—"যক্ষ্মা!"

[ ১১ ]

## মাতৃ-কাঙাল

শীতের আমেজ কাটিয়া গেছে।—বসন্ত, কোকিলের মুখে আগমন-বার্ত্তা পাঠাইয়াছে।

সুরনাথবাবু অনেকক্ষণ কলেজে চলিয়া গেছেন। বালকবালিকারাও যে যার ইস্কুলে; গৃহিণী কাজে ব্যস্ত।

সুকুমার অতি জরাজীর্ণ ঘুণধরা দেহটা কোনরকমে লাঠির সাহায্যে বিছানা হইতে খাড়া করিয়া, ধীর-সন্তর্পণে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

কোটরগত চক্ষু, শতছিন্ন ফুসফুস, কম্পমান দেহ—কঙ্কালসার! কিন্তু অন্তরে চিন্তার সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে—এ বিশ্ব-চরাচরে সে কোথায় আসল শান্তির মুখ দেখিতে পাইবে?

রৌদ্র ক্রমেই প্রখরতর হইতেছিল। গত তিনদিন হইতে রক্ত-উঠা কমিয়া গেছে,—সুকুমার সেইজন্যই অনেকখানি ভাল ছিল।

আজ গাছে-গাছে, লতাপাতা-ফল-ফুলে, পশুপক্ষীর ঝঙ্কারে-কুজনে সে নিয়তই মলিনার মৃত্যু-কালীন রোদন শুনিতে পাইল!—হায়রে সংসার! এখানে থাকিব বলিলেই যদি থাকিবার উপায় মিলিত! অনিচ্ছায়

আপনা হইতে পলায়নের এতবড় মর্ম্মান্তিক কৌশল বুঝি কোনখানেই খাটানো চলে না!

কিন্তু এই আলোবাতাস-হারা ভবনের অঙ্গনে, শান্তি-স্নিগ্ধতার লেশ-বিবর্জ্জিত এই চতুঃসীমার মাঝে, মৃত্যু-পথ-যাত্রীর বেশে আর কতদিন সে মলিনার জন্য যাতনাময় জীবন বহন করিবে?……

সুকুমার আস্তে আস্তে সুরনাথবাবুর বাড়ী হইতে বাহিরের রাজ-পথে আসিয়া দাঁড়াইল। অসংখ্য জন-কোলাহলের মাঝে, একজন অতি ক্ষীণ পথিকের স্খলিত-চরণের ভগ্ন-ভঙ্গিমা আজ আর কাহারো নয়নগোচর হইল না।

সুকুমার পায়ে হাঁটিয়া চলিতে চলিতে অকস্মাৎ যে স্থানে আসিয়া থামিয়া গেল—সে অন্য কিছু নয়—রেলওয়ে-ষ্টেশন।

মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সুরু হইয়া গেল। বিশ্ব-সংসারের সকল মমতার সকল আহ্বানধ্বনি থামিয়া গেছে—আছে শুধু তার—জন্মদুঃখিনী মায়ের আকুল সম্বোধন—'ওরে বাছা, ফিরে আয়! ফিরে আয়!—জন্ম-কাঙালিনী অভিশপ্তা জননীর কোলে তুই ফিরে আয় বাবা!"

লাঠিতে ভর দিয়াই চলিতে চলিতে, প্লাটফর্ম্মের এক কোণে আসিয়া সুকুমার দেখিল—একটি বাঙালী কেরাণী তাড়াতাড়ি সেইদিকেই আসিতেছে। হঠাৎ আপনার অজ্ঞাতেই তার ডানহাতখানা বাবুটির সুমুখে অগ্রসর হইয়া গেল।—মশায়! দয়া কোরে একটা উপকার করবেন?—আমার হাতের একটি আংটি রেখে, গোটা পঞ্চাশ-ষাট টাকা এনে দিতে পারেন? আমি বড্ড বিপন্ন।

বাবুটি থামিয়া গেল। কহিল—মাপ করবেন, আমি পারবো না।…

কিন্তু আংটিটার পানে চাহিতেই, তার দু-চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া গেল !—এ-তো সাধারণ নয় !—এ যে মহামূল্য !

সুকুমার কহিল—একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারলে বড় উপকার হ'ত মশায় !•••কাছে পয়সাকড়ি নেই, অথচ আজই আমার কাশী যেতে হবে। সেখানে আমার মা, আমার জন্যে—কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাচ্ছেন।

বাবুটি ষ্টেশনেই চাকরি করিত। সুকুমারকে যে নিতান্তই চিনিত না—এমন নয়। আংটি লইয়া প্রায় আধ ঘণ্টা পরে পঞ্চাশ টাকা যখন সুকুমারের হাতে আনিয়া দিল, তখন কাশীর ট্রেন প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া।

বাবুটি জিজ্ঞাসা করিল—আপনার অসুখ ছিল যে ?—এখনই যাবেন ?

সুকুমার তখন টিকিট-ঘরের দিকে।......

*  *  *  *  *  *

কাশীর বাড়ীতে পৌঁছিয়া, সুকুমার অঙ্গন হইতে ডাক্ দিল—মা ! মা ! জ্বরে তখন তার গা পুড়িয়া যাইতেছে !

কিন্তু কই মা ? কোথায় মা ?—কে আজ মাতৃ-কাঙাল সন্তানের আকুল আহ্বানে সাড়া দিবে ?—শূন্য বাড়ী খাঁ খাঁ করিতেছে ! কেহই নাই—সুকুমারকে 'এসো' বলিয়া ঘরের ভিতর অভ্যর্থনা করিতে কেহ নাই আজ।

•••নীচের একখানা ঘরে কাশীবাসী এক দ্বারবান্ ছিল,—সদর দরজা খোলা রাখিয়াই, সে সম্ভবতঃ অন্য কোথাও সুখান্বেষণে চলিয়া গেছে।

রাত্রি নিশীথ-সীমায় !—জ্বর-তপ্ত ললাটে শীতল সান্ত্বনার স্পর্শ পাইবার

জন্য সুকুমার অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন এক বারান্দায় পড়িয়া, সে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মৃত্যু-আশঙ্কা করিতেছিল।—আর বুঝি মায়ের কোলে মাথা রাখিবার সৌভাগ্য লাভ তাহার দগ্ধ-অদৃষ্টে মিলিবে না।

পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। জ্বরের ঘোরে সুকুমার অর্দ্ধ-চেতন। এমনি সময় দ্বারবান মহারাজ নৈশ-সুখভোগের পর, ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রি তখন অবসানের সীমায়।

বিকারের ঘোরে সুকুমার মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বকিতেছিল—বিজয়া! বিজয়া!—কেন চলে এসেছিলাম, কেন তোমায় বুঝিনি, কেন আমাকে তোমাদের বুঝতে দিইনি!—আজ পরপারের উদ্দেশে পা বাড়িয়ে, কেমন ক'রে বুঝিয়ে যাবো কেন দিইনি—কেন পারিনি?

দ্বারবান টলিতে টলিতে আসিয়া, হাতের লাঠিগাছটি রুগ্ন অৰ্দ্ধমৃত সুকুমারের পৃষ্ঠে বসাইয়া দিল। তোম্ ডাকু হ্যায় রে!—কোঠিমে কিয়া হোতা?—

কিন্তু এ-কথার জবাব দিবার মত অবস্থা সুকুমারের ছিল না। লাঠির আঘাতে সে আর্ত্তনাদ করিয়াই জ্ঞান হারাইল।

দ্বারবান্ তখন প্রভুকার্য্য সাধিতে পুলিসের সন্ধানে বাহির হইল।...আসল প্রভু যে, ভৃত্যের লগুড়াঘাতে আজ সে চেতনহারা!

*** সুকুমারের যখন জ্ঞান হইল—তখন জনতায় বাড়ী পূর্ণ। বেলাও অনেকখানি হইয়াছে। সে চাহিয়া দেখিল—শিয়রে চার-পাঁচজন পুলিসের লোক দাঁড়াইয়া আছে।

একজন কহিল—এখানে কেন এসেছিলে? চুরি করতে?—দেশ কোথা তোমার?—বাঙ্গলা মুলুকে?...কবে কাশীতে এসেচ? নাম কি?

সুকুমার নির্ব্বাক! কেমন করিয়াই বা পরিচয় দিবে? যে বিরাট দানের বোঝা বহিতে না পারিয়া সে মাতৃ-সংসর্গটুকুও একান্ত দুঃখের সহিত ছাড়িতে বসিয়াছিল—আজ আবার সেই পরীক্ষার মাঝখানেই বিশ্বনাথ তাহাকে টানিয়া আনিলেন। কিন্তু তখনি তাহার মনে পড়িল —মরণের দুন্দুভি যার শ্রবণের দুয়ারে বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার আবার মান-অপমান-সম্ভ্রম-লাঞ্ছনার খবরে কি যায় আসে? কিন্তু অভিমানী অন্তর বিদ্রোহী হইয়া পড়িল। ক্ষীণস্বরে সুকুমার পুলিশের কথার জবাব দিল—আমার কেউ নেই, আমি অসুস্থ, পথ চ'ল্‌তে পারিনে, তাই খোলা বাড়ী দেখে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আপনাদের সন্দেহ হয়, থানায় নিয়ে চলুন।

কিন্তু বুদ্ধিমান পুলিশ বাবুটি বাস্তবিকই সন্দেহ করিলেন না।……

…বাড়ীতে তখন দারোয়ান ও সুকুমার ছাড়া দ্বিতীয় কেহ উপস্থিত নাই।

সুকুমার কহিল—তোমার মনিব কোথায়?

দারোয়ান চোখ-মুখ রাঙা করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—তাতে তোমার কি কাজ? যদি বলি এ বাড়ী আমার?

—বেশ।

তবুও মাতৃ-পরিচয় দিয়া আজ এই বিশালপুরীর একাধিপত্য করিতে তার একটুও বাসনা হইল না। কহিল—একটু জল দেবে ভাই? বড্ড পিপাসা। আমি জল খেয়েই চ'লে যাবো। তোমাকে এক মিনিটও আর বিরক্ত করবো না।

কাশীবাসী দারোয়ান্ বার দু'তিন 'ছো ছো' করিয়া কাশীশ্বর কাশীনাথের নাম উচ্চারণে পবিত্র হইল, তবু অপরিচিত এই আতুরের তৃষ্ণার

কণ্ঠে এক কণা জল দিয়া নিজে অপবিত্র হইতে চাহিল না।—চণ্ডাল না ম্লেচ্ছ—কী জাত, কে জানে!

একটা লাঠির আঘাতে তো প্রাণবায়ুই বাহিরে চলিয়া যায়—সুকুমারের এমনিতর শারীরিক অবস্থা! হঠাৎ দারোয়ান্‌জীর গলাধাক্কা খাইয়া সে রাজপথে আসিয়া প্রবল জোরে হাঁপাইতে লাগিল। মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরিতে ছিল।

একবার ইচ্ছা হইল, হাঁসপাতালে আশ্রয় লয়। কিন্তু কাশীর বাতাসে তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। ধর্ম্মের এ পবিত্র সমারোহে, তার বুঝি তিল-পরিমিত স্থানও এখানে পাওনা নাই! এতই সে মহাপাতকী।

দারোয়ান্ তখন চীৎকার করিয়া বলিতেছে—ভাগো! ভাগো!

সুকুমার টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। চলিতে চলিতে বলিয়া গেল—তোমার মনিব ফিরে এলে, ব'লো—সুকুমার এসেছিল।—ক'লকাতার হাঁসপাতালে চ'লে গেছে।

দারোয়ান্ বিশেষ কিছু বুঝিল না বটে, কিন্তু তবু সে অন্তরে অন্তরে অশান্তি বোধ করিল।

সুকুমার তখন রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইবার জন্য গাড়ী ভাড়া করিতেছে।



সুকুমার নাই—নাই।

…সুরনাথ বাবু প্লাটফর্মের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

[ ১২ ]

# আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!

সুরনাথ বাবু কলেজ হইতে বাটী ফিরিয়াই দেখিলেন—সুকুমারের শূন্য বিছানা খাঁ খাঁ করিতেছে! গৃহিনী কিছুই জানিতেন না। অসুখ অবস্থায় এমন তো কতদিনই সুকুমার না খাইয়া পড়িয়া থাকিত। আজ যে সে পলায়ন করিবে—কে তাহা অনুমানে আনিয়াছিল?

সুরনাথ বাবু রেল-ষ্টেশনে আসিয়া ভাবিতে বসিলেন—সুকুমার কোথায় গেল? কোথায় যাইবেন, কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া প্লাটফর্ম্মের উপর বসিয়া পড়িলেন।

এমনি সময় ষ্টেশনের একটি বাবু, তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতে উঠাইতে বলিল—আপনার নামে একখানা চিঠি রয়েচে,······কাল পেয়েছি কিন্তু দিয়ে আসা হয়নি।

সুরনাথ পাঠ করিলেন—

আমি মাতৃদর্শনে কাশী যাইতেছি। আমার গমনে বাধা দিবেন না, এবং আর কোন অনুসন্ধান করিবেন না। মলিনা চলিয়া গেল, সে আর কতদিন আমার জন্য কাঁদিয়া কাটাইবে? সুতরাং যাত্রার দিন যথন

নিকট হইয়া আসিতেছে, তখন মিথ্যা আর মায়ার বাঁধনে কি ফল ফলিবে? প্রণাম। ইতি—সুকুমার।

……সুরনাথ বাবু ছিলেন অতি সজ্জন, সরল এবং মহা বিদ্বান্। সুকুমারের মনের ব্যথা তিনি খুব বিশদভাবেই আপন মনে ব্যাখ্যা করিয়া লইলেন, এবং তাহার অনুরোধ রক্ষা করাই কর্ত্তব্য ও যুক্তিযুক্ত মনে ভাবিয়া, ভগ্ন-অন্তরে বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

* * * *

একটি বড় জংশন ষ্টেশনে অনেকক্ষণ গাড়ী থামে, এবং যাত্রীরা জল খাওয়া বা অন্যান্য অবশ্য দরকারী কাজের সুবিধা পায়।

বেলা আন্দাজ দুইটা। পশ্চিমের একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ অনেকক্ষণ হইতেই এই জংশনে থামিয়া আছে।

প্রথম শ্রেণীর একখানি ছোট্ট রিজার্ভ-কামরায় কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার—রাধারমণ সেনের জামাতা—প্রভাসচন্দ্র, পত্নী বিজয়ার সহিত গল্প করিতেছিল। গত পনর দিন হইতে কলিকাতা ছাড়িয়া উহারা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। আজ ফিরিয়া আসিতেছে।

বিজয়া বলিল—এখানে দিনকতক থাকৃলে বেশ হয়। দেখ কেমন পাহাড়ের দেশ। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গা ফুঁড়ে এক একটা ছোট্ট নদী চ'লে গেছে! ভারি সুন্দর কিন্তু।……ক'লকাতায় কি বা আছে ছাই! খালি খালি মোটর—আর গাড়ী, গাড়ী আর মোটর। ভাল লাগে না কিন্তু।

প্রভাস সপ্রেমদৃষ্টিতে পত্নীর মুখপানে চাহিয়া বলিল—তা'হলে ঘর-বাড়ীটাও তোমার নেহাৎ অপছন্দ?

বিজয়া বলিল—নিজের দেহটাকে কি মানুষ খারাপ বল্‌তে পারে? না—বল্‌লেই চলে কখনো? সংসারে থাকৃতে গেলেই ঘরবাড়ী ছাড়া থাকা চলে না। কিন্তু সারা বছর এক-ঘেয়েমী বরদাস্ত হয় না আমার।... ...চলো না, বেশী দিন নয়, মাত্র দুটো দিন থাকৃবো। এ-অঞ্চলটা আমি কখনো দেখি নি।

—আর আমি বুঝি এই দেশেই বাস ক'রে বুড়িয়ে গেছি, না?—ওসব আমার ভাগ্যেও ঘটে নি বিজয়া! কিন্তু আর তো আমরা অপেক্ষা করতে পারি না। সাম্‌নে হপ্তায়, সেই বড় মামলাটার দিন পড়েচে। যেমন ক'রে হোক যেতেই হবে।

বিজয়া বিরক্তভাবে বলিল—মাম্‌লা আর মাম্‌লা, জ্বালাতন ক'রে মারলে। তার চেয়ে যদি গান-বাজনা শিখ্‌তে, দুজনে আমোদে দিন কাটিয়ে দিতাম।......আচ্ছা অনেককাল তো বিলেতে থেকে এলে, একটা যেমন তেমন পিয়ানোর গৎ কি হারমোনিয়মের বাজনাও শিখ্‌তে পারলে না?......কী করতে সেখানে? পড়াশুনো নিয়েই তো আর মানুষের চব্বিশ ঘণ্টা কাটে না?

প্রভাস চাহিয়া দেখিল—গাড়ী ছাড়িবার সঙ্কেতধ্বনি হইতে আর বিশেষ দেরী নাই। রেড সিগ্‌নাল নামানো হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি নামিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার ও গার্ড সাহেবের সহিত বন্দোবস্ত করিল যে, তাহাদের জন্য আজ হইতে চারিদিন পরে, এই ষ্টেশনেই যেন রিজার্ভ গাড়ী ঠিক থাকে। তারপর বিজয়াকে নামাইয়া ভৃত্যদের লগেজপত্র নামাইবার হুকুম দিল।

বিজয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল—কিন্তু রাতের বেলা ঘুমিয়ে

ঘুমিয়ে মামলা চালাবে না তো? সে কিন্তু বড্ড বিশ্রী। আমার ভয় করে।

প্রভাস হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। কহিল—আচ্ছা ক'দিন তুমি ঘুমের ঘোরে আমাকে মামলা করতে দেখেচ বিজু? মিছি মিছি লোকের ঘাড়ে দোষ চাপানো—

কথার মাঝেই বিজয়া বলিয়া বসিল—ভয়ানক বে-আইনী—কেমন? এই কথা ব'লবে তো? কিন্তু মাইরি বলছি—সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া আমার পক্ষে বড্ড মুস্কিল। নইলে হাতে-হাতে ধ'রে দিতাম।......

প্রভাস কহিল—কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তো আমাদের চলবে না বিজয়া! চলো এখন থেকে একটা ডেরা-ফেরা যা হয় ঠিক কোরে রাখি। তোমার তো যেখানে সেখানে থাকা পছন্দ হবে না?

রাগিয়া বিজয়া বলিল—আর তোমার বুঝি বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে, নদীতে—যেখানে হোক সমান পছন্দ? নাও এখন চলো—কোথায় তোমার ডেরা দেখি।...আমার কিন্তু একটুও আপত্তি নেই, তোমার সঙ্গে আমি সব জায়গাতেই যেতে রাজী।...

প্রভাস সস্ত্রীক একটা ডাকবাংলায় আসিয়া বাসা লইল।

সন্ধ্যার পর ভাড়াটে একখানা মোটরে চাপিয়া, যখন স্বামী-স্ত্রী ভ্রমণে বাহির হইল, তখন আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা যাইতেছিল।

পশ্চিমের সহর, ইহার মধ্যে গ্রীষ্মের রীতিমত আমেজ আসিতেছে। সান্ধ্য সমীরের মৃদু পরশে বিজয়া পরম পুলকিত হইয়া কহিল—আঃ, ক'লকাতার পথঘাটগুলো যেন নিশ্বাস ফেলবারই অবকাশ

পায় নয়! আচ্ছা সত্যি বল্‌তে হবে—জায়গাটা তোমার ভাল লাগে না?

প্রভাস স্মিতমুখে জবাব দিল—সত্যি কথা বল্‌তে কি বিজু, তুমি যদি সঙ্গে থাকো, তাহলে বন-জঙ্গলই আমার বৈকুণ্ঠপুরী! কিন্তু মনে রেখো, ভাল জায়গা ভেবে যেন হপ্তা দু'চার থাকতে চেয়ো না। তা'হলে ডান হাতের কাজ একদম বন্ধ হয়ে যাবে।

বিজয়া স্বামীর কথার জবাব দিতে অবকাশ পাইল না। অদূরে জনতা দেখিয়া বলিয়া উঠিল—ওখানে অত ভিড় কেন?—দেখ দেখ—বোধ হয় কোনো অভাগা গাড়ী চাপা প'ড়েছে।

মোটর থামিলে বিজয়া আগেই নামিয়া পড়িল। প্রভাস আর কি করে, তাহাকেও অগত্যা নামিতে হইল।

জনতার নিকট আসিয়া উভয়ে দেখিল—রোগজীর্ণ অতি ক্ষীণকায় একজন লোক, পথের ধারে পড়িয়া আছে, এবং তাহারই চতুষ্পার্শ্বে ভিড় করিয়া বিস্তর লোক জমিয়াছে। কঙ্কালসার ব্যক্তি অর্দ্ধচেতন, তবু তাকে জনতা বিশ্রাম দিতে চায় না,—কে তুমি, নাম কি?—বাড়ী কোথা—ইত্যাদি অজস্র প্রকারের প্রশ্নবর্ষণ হইতেছে, অথচ জবাব দিবার মত লোকটির বিন্দুমাত্র শক্তি নাই।

অতি-কোমল নারীচিত্তে দারুণ আঘাত বাজিয়া উঠিল। বিজয়ার মুখ হইতে আকুল অস্ফুট স্বর বাহির হইল—আহা! বেচারীর কি কেউ নেই? ওগো দেখ না—একবারটি।

প্রভাস ভিড় ঠেলিয়া নিকটে আসিতেই, জনতা রোগীর কাছ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

প্রভাসও প্রশ্ন করিয়া কোন জবাব পাইল না। জনতার মধ্যে দু' এক জনকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিল—প্রায় এক ঘণ্টাকাল সে রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছে, কিন্তু কথার জবাব দেয় না।

বিজয়ার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।—উঃ এমন ভাগ্যও মানুষের হয়! কোথায় রহিল মাতা-পিতা-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়-পরিজন! আজ অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় অচেনা-অজানা স্থানেই বুঝি অভাগার ইহজনমের হিসাবনিকাশ শেষ হইয়া যায়! সে স্বামীকে অনুরোধ করিল—ওগো! আর দেরী ক'রো না, ওকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে বাসায় চলো। চেষ্টা করলে হয়তো বাঁচতে পারে।

প্রভাস তৎক্ষণাৎ রোগীকে নিজেদের মোটরে তুলিয়া লইয়া, অতি সত্বর ডাকবাংলায় ফিরিয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যকে ডাক্তারের খোঁজে পাঠাইয়া দিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনমানসে গৃহান্তরে গমন করিল।

বিজয়া রহিল—সেবার অনিন্দ্য প্রতিমার মতই, সর্ব্ব-আত্মীয়হারা অভাগার শিয়রদেশে বসিয়া।

বিজয়ার আঁখিতে পলক পড়ে না, মুখে বাক্ সরে না—একান্ত বিহ্বলতায় সে এই অন্তিম-দুয়ারে সমাসীন রোগীর মুখপানে চাহিয়া অতীতের অস্পষ্ট অথচ কঠোর এক স্মৃতির লিপি পাঠ করিতেছিল।

মনোবীণার তারে তারে ঘা লাগিয়া ঝঙ্কার বাজিতেছিল। বিস্মৃতির লৌহ-কপাট কে যেন আকস্মিক করাঘাতে উন্মুক্ত করিবার দৃঢ়প্রয়াস দেখাইতেছিল!—কে—এ? সেই—ঠিক তেমনি!…কিন্তু এমন হইল

কেমন করিয়া? শাপভ্রষ্ট দেবতার অদৃষ্টেও কি এ-হেন কঠোর নির্ম্মম যমযন্ত্রণা লিপিবদ্ধ থাকে? মানুষের অদৃষ্ট হইলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু সে তো মানুষ ছিল না! অগাধ ঐশ্বর্য্যের মাঝেও ঐকান্তিক আদর-যত্ন অবজ্ঞাভরে পায়ে ঠেলিয়া যে চলিয়া আসিতে পারে,—সে কি মর্ত্ত্যের মানব? কিন্তু তবুত এ যে সেই-ই!···আজ যদি বিজয়ার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হইয়া যাইত,—তবু সে তো এই সংজ্ঞাহারা হতভাগ্যের মরণঘেরা মূর্ত্তি চিনিয়া লইতে বিলম্ব করিত না! হায় হায়! দেখিবার মত দেখা সে তো বহুবারই দেখিয়া রাখিয়াছে!

রোগী তখন প্রলাপ বকিতেছে—চাকা আর কতবার ঘুরবে গো! কখনো মলিনা কখনো···কিন্তু নাঃ!···এইবার ভেঙ্গে পড়ুক সব। আর আমার সাধ্য নাই!······এত বড় অভিশাপের বোঝা মাথায় ব'য়ে ব'য়ে আর তো আমি থাকবো না। আমি শোধ নেব। নিজের কাছে নিজেই কড়া হ'য়ে প্রতিশোধ নেব।···যাতনা যে সয় না আর।

সজল চক্ষু বার বার মুছিতে মুছিতে ভয়ে ভয়ে অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে বিজয়া ডাকিল—দাদা! সুকুমার দা!

হৃদয়ের আসল তন্ত্রীতে আঘাত পড়িলে—ঝঙ্কার প্রবল হইয়া উঠে। সুকুমার সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল। বিজয়ার আকুল সম্বোধন তার সুপ্ত শ্রবণ-শক্তিকে সহজেই সচেতন করিতে পারিল।

সুকুমার অর্দ্ধ-উন্মাদের ন্যায় উদাস দৃষ্টিতে বিজয়ার পানে চাহিল। আহা! এ যেন ইহলোকের দুয়ারে—পরলোক-যাত্রীর হৃদয়ভেদী করুণ যাচ্ঞা!—ওগো! আবার আমার বাঁচিবার সাধ হয়। মরিবার জন্য তেত্রিশ

কোটী দেবতার পায়ে বহু বহুবার মাথা নোয়াইয়াছি, আজ আবার তাহাদেরই কাছে অঞ্জলি পাতিয়া ভিক্ষা চাহি—দাও—দাও গো! আমার ক্ষুদ্র প্রাণ আমারই কাছে ফিরিয়া দাও। আমি কোথাও যাইতে চাহি না, এ-পারের পাওনা-দেনার এখনো যে অনেক হিসাব আমার বাকী পড়িয়া রহিয়াছে!

বিজয়া আবার ডাকিল—দাদা আমার! সুকুমার দাদা!—এমন দশা তোমার কেন হ'ল?—কেমন কোরে হ'ল?

সুকুমার কথা বলিতে চেষ্টা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই, এক ঝলক্ রক্ত তাহার মুখ হইতে বয়্ বাহিয়া উপাধান সিক্ত করিল।

বিজয়া তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া পরিষ্কার করিতে করিতেই বুঝিল—সুকুমার পুনরায় জ্ঞান হারাইয়াছে।

ইতিমধ্যে প্রভাস বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিয়া আসিল।

বিজয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল—ওগো! তুমি নিজে যাও। যত টাকা লাগে—ডাক্তার নিয়ে এসো!—আমার সুকুমার দাদাকে এমন কোরে আমি যেতে দিতে পারবো না যে।...

একান্ত বিস্ময়াভিভূত প্রভাস কোন অর্থই খুঁজিয়া পাইল না। একটা দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালির মতই বিজয়ার কথা সে মনে মনে আলোচনা করিয়া, মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বিজয়া বলিল—এ যে আমাদের সুকুমার দাদা!...সকল রকমের গুণী হ'য়েও সামান্য ড্রাইভার ছিল।

প্রভাসের আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রোগীর মুখ-পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিল—অসম্ভব পরিবর্ত্তন! এত অল্প দিনে মানুষের

এমন পরিবর্ত্তন হ'তে পারে! তারপর সে নিজেই ডাক্তারের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল।...

...প্রায় ন'টা রাত্রিতে ডাক্তার আসিলেন। বেশীক্ষণ পরীক্ষা করিতে হইল না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ডাক্তারে সুরনাথবাবুর নিকট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, এ ডাক্তারও তাহাই বলিলেন—"যক্ষ্মা !!"

বিজয়া কাঁদিয়া উঠিল! প্রভাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৃত্যুছায়া-মলিন সুকুমারের পাণ্ডুর মুখপানে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।...আজ যেন আমাদের অনাবিল সুখ-শান্তি-সরোবরের বুকে, মৃত্যু আসিয়া প্রবল অশান্তির তুফান তুলিয়া দিয়াছে!......

ডাক্তার প্রাতঃকালে আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রস্থান করিলেন, প্রভাস কহিল—আমি একজন নার্স পাই তো ডেকে আনি বিজয়া, ছোঁয়াচে রোগ, তোমার থাকা উচিত নয়।

বিজয়া বলিল—রোগে আর বেশী কি করবে?—বড় জোর আমাকেও আক্রমণ করবে—এই তো?—করুক। সুকুমারদার সেবা কোরেও যদি মরতে পারি, জান্‌বো—লক্ষ পাপের বোঝা আমার পুণ্যের বোঝা হয়ে গেছে। ...ওগো! তুমি তো জানোনা, আমার বাবাকে এই সুকুমারদা'ই যমের কাছ থেকে লড়াই কোরে ছিনিয়ে এনেছিল।

প্রভাস আর তর্ক করিতে চাহিল না। সেবারতার অম্লান অপার্থিব সৌন্দর্য্য-চলচল মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া, তাহার আজ সর্ব্ব প্রথম এই কথাই মনে জাগিল—বিজয়াকে লাভ করিয়া সে ধন্য হইয়া গেছে; বিজয়া নারীরত্ন।......

বিজয়া তখন সুকুমারের চোখের কোণে সঞ্চিত অশ্রুবিন্দু মুছাইতে ব্যস্ত ছিল।

প্রভাস একটা ইজি চেয়ার টানিয়া সেই ঘরেই রাত্রির মত ঠাঁই করিয়া লইল। কিন্তু বিজয়া বাধা দিয়া বলিল—তুমি পাশের ঘরে যাও। দরকার হ'লে আমি ডাকৃবো। রোগীর ঘরে বেশী লোক থাকা ভাল নয়।

প্রভাস যেন আচম্বিতে আজ বিজয়ার সমস্ত আদেশ নির্ব্বিচারে প্রতি-পালন করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে। দ্বিরুক্তি না করিয়া সে পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় কহিল—খুব সাবধানে থেকো। বেশী গোলমাল করা হবে না। বাড়াবাড়ি বুঝ্‌লে আস্তে আস্তে আমায় ডেকো। থাইসিসের রুগী, লোক জানাজানি হ'লে ডাকবাংলা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে।

বিজয়া হতভম্বের মত চাহিয়া রহিল।—এ কি সর্ব্বনাশের কথা!—তাহার সুকুমার দাদাকে ইহারা কি একটুও চেনে না? রোগ হইয়াছে বলিয়াই কি আজ সে মনুষ্যত্বের কাছে এমন নিষ্ঠুর ভাবে অপমানিত হইয়া যাইবে?

* * * নিশীথ রাত্রি। সহর হইলেও পথে-ঘাটে এতটুকু সাড়া মেলে না।

পাশের ঘরে প্রভাস নিদ্রা যাইতেছে, আর বিজয়া অর্দ্ধমৃত সুকুমারকে একান্ত স্নেহ-শীতলতায় জড়াইয়া ধরিয়া, ভগবানের চরণে ব্যগ্র অন্তরের নালিশ জানাইতেছে—ঠাকুর! হে মধুসূদন! তোমার নিজের মাপে ওজন করা আইন-কানুনে এত ফাঁকি-বাজী কেন?—সুকুমারদার এমন

দশা তুমি কেন করলে ?—কোন্ পরাণে ? এই মহাভুলের স্পষ্ট কৈফিয়ৎ তোমার কতটুকু আছে ?

ধীরে ধীরে সুকুমার চক্ষু মেলিল। বিজয়ার পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিল—তুমি···বিজয়া—না ?······এখানে এলে কখন ?—আমাকে তোমাদের কাছে কে রেখে গেল ?

বিজয়া জবাব দিবে কি—কাঁদিয়া ভাসাইল।

সুকুমার কোটরগত চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া বিজয়ার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বলিল—নিমু আসে নি বিজু ?···আমার নির্ম্মল আসে নি এখানে ?

বিজয়া চোখ মুছিয়া বলিল—তোমার নির্ম্মলকে তুমি দেখ্‌বে দাদা ? তাকে খবর পাঠাবো ?

সুকুমারের মুখে অতি সুস্পষ্ট ভাবে বেদনার চিহ্ন দেখা দিল। আপন মনেই বলিল—সে কপাল কি হবে! ততদিন কি এ দুনিয়ায় থাকৃতে আমি পাবো ? বিজয়াকে বলিল—তুমি একা এসেচ বিজু ?···সঙ্গে আর কেউ নেই ?···প্রভাসবাবু কেমন আছেন ?

বিজয়া বলিল—তিনি পাশের ঘরে রয়েচেন। ডাক্‌বো তাঁকে ?··· আমরা পশ্চিমে বেড়াতে এসেছিলাম দাদা! কিন্তু তোমাকে এমন ভাবে দেখ্‌তে হবে—তা-তো স্বপ্নেও ভাবিনি! এমন সর্ব্বনাশ আমাদের কেন হ'ল দাদা ?

সুকুমারের ম্লান অধরে হাসির রেখা দিল। যেন কৃষ্ণ-মেঘাবৃত শশীর মৃদু বিকাশ!···কহিল—অল্প এই ক'টাদিনে তুমি তো অনেক রকম কথা শিখেচ বিজয়া!···বিজয়া! সর্ব্বনাশ হওয়ার কৈফিয়ৎ কি কেউ

দিতে পারে ভাই ? স্বয়ং ভগবানের মনে নেই—মানুষ তো কোন্ ছার ! ...কিন্তু এ সব সর্ব্বনাশ নয় বিজু !—সবই মঙ্গল ।—ভগবানের রাজ্যে মানুষের অমঙ্গল হয়—একথা যে বলে আমি তাকে বোকা বলতে চাইবো। তুমি তো জানো বিজয়া !—লেখাপড়া আমি অনেক করেছি, তবু এত বড় বিশ্বাস আমার মনে আছে যে,—মানুষের মঙ্গলের জন্যেই মানুষের অমঙ্গল দেখা দেয়। পাপী অধঃপাতে যায়—সে নিজেরই গতি-মুক্তির উপায় কোরে নিতে। অত্যাচারীর মৃত্যু হয়—নিরীহকে নিরাপদ করতে।—এ বড় জটিল সমস্যা বিজু ! সবকথা তুমি বুঝবে না। সময় থাকলে বুঝিয়ে দিয়ে যেতাম।...কিন্তু সত্যিই কি আমি বাঁচবো না বিজয়া? ডাক্তারের মুখ থেকে এতটুকুও ভরসা মিললো না ?

বিজয়া জোরে জোরে ফুঁপাইতে লাগিল।—"ভয় কি—সেরে উঠবে" —একথা বলিয়া সুকুমারকে ও আপনাকে অনর্থক বঞ্চনার চাতুরী দেখাইতে পারিল না।—হায়রে বিধিলিপি !—খণ্ডন যার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনখানেই মিলিতে চাহে না, তাহার নির্ম্মম আচরণে এমন বিভীষিকার সৃষ্টি কেন আসে !

সুকুমার কহিল—দেখ্ ভাই বিজু ?

—কি দাদা ?

—একটা আমার সাধ ছিল,—যদি মিটাবার আশা থাকে—

—কি সাধ দাদা ? বলো—আমার মৃত্যু দিয়েও তোমার সাধ আমি মিটিয়ে দিতে চাই। বলো—

হাসিয়া সুকুমার বলিল—বিয়ে হ'তে না হ'তেই দেখ্‌চি বাজে কথার জাল বুনতে শিখে ফেলেচিস্—বিজয়া !—হাঁ রে, মৃত্যু দিলেই

বুঝি সর্ব্বস্ব দেওয়া হয়?—সে তো মানুষ হয়ে মানুষকে ঠকানোর কৌশল। নইলে, শাস্ত্রে বলেছে কেন যে,—আত্মহত্যা মহাপাপ।…কিন্তু আসল কথা কি জানিস্? আমার সাধ হচ্ছে—যদি একবারটি কলকাতায় যেতে পারতাম!…মরতে তো হবেই ভাই! তবু নিমুটাকে একবার দেখে ম'লে…

বিজয়ার দু-নয়ন অশ্রু-কুহেলীতে ঝাপ্‌সা হইয়া গেল।……কঠোর পাষাণ-চাপ ঠেলিয়া আর্ত্তনাদের ব্যথাভরা স্বর বাহির হইতে চাহিল—ওগো ভগবান্! ওগো বিশ্ব-বিপদ-হন্তা! তোমার কাজ তুমি যদি না করিবে, তবে কাহার এমন স্পর্দ্ধা আছে, যে নির্ব্বিবাদে শেষ করিতে পারে?…বিশ্বের বিপদভঞ্জন করিতেই যে অন্ধকারেও তোমার স্বরূপ বিকাশ পায়! তবে কেন আজ এমন অবিচার? এমন ভুল?—সর্ব্বশক্তি-মানের এ-হেন দুর্ব্বলতা?

সুকুমার পুনঃ প্রশ্ন করিল—উপায় নেই বিজয়া?……তোকে তো কোনদিনই পর ভাববার ইচ্ছা করি নি দিদি!……আজ মনের কথা বলচি,—নিমুকে না দেখ্‌লে আমি মরতে সাহস পাবো না ভাই।……উঃ এ যে কী দুঃসহ কষ্ট বিজয়া! বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। শতছিদ্র এই বুকটার মধ্যে সে ব্যথা সইতে পারার শক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। এত কষ্ট বিজয়া!…এত আমার যাতনা!…নির্ম্মলকে যদি এ সময় ভুলে যেতে পারতাম!…মনের মধ্যে লক্ষ বৃশ্চিকের দংশন সুরু হয়েচে বিজয়া! বোঝা হাল্কা না করলে, পরপারের নৌকোয় পা দিতে পারবো না। পাছে মাঝ দরিয়ায় তরী ডুবে যায়!……

ভোরের বাতাস বহিতে সুরু হইয়াছে। জানালার ফাঁক দিয়াই

বিজয়া দেখিতে পাইল—শুকতারা রাজ্যের উৎসাহ আনিয়া আকাশের কোলে প্রভাত-বন্দনার আসর সাজাইতে ব্যস্ত !···বিজয়ার মনে হইল—কি কালরাত্রিই না জাগিয়া কাটাইল সে !···যেন মানসিক তেজের সঙ্গে দুর্ব্বলতার সংগ্রাম।···মনে মনে উচ্চারণ করিল—সুপ্রভাত সুপ্রভাত !···সুকুমারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—আজই আমরা ক'ল্‌কাতা রওনা হবো দাদা ! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সুকুমারের চোখের কোণে জল জমিয়া গেল। কহিল—কিন্তু সাবধানে যেয়ো দিদি ! প্রভাস বাবুকেও সাবধানে রেখো। যদি পথের মাঝেই আমাকে ধ'রে নিয়ে যায়, তাহ'লে এই মরা দেহটা নিয়ে তোমাদের দুর্গতির আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না।···ছুটী যার মঞ্জুর হয়ে রয়েচে, তার তো চ'লে যাওয়ার কোনও বাধা নেই কিনা !······ভরসার মধ্যে হিসেব-নিকেসটা পুরোপুরি মিটমাট্ হয় নি।

বিজয়া কহিল—খানিকক্ষণ ঘুমোবার চেষ্টা করো দাদা ! তোমার নির্ম্মলকে দেখ্‌বার সাধ থাক্‌লে, দেহকে বিশ্রাম দিতে হবে।

সুকুমার বলিল—হিসেবের খাতায়, হাসি-তামাসার ঘরে আমার আর একটা অঙ্কও জমা নেই বিজয়া ! তবু তোর কথায় হাসিই পাচ্ছে !···ওরে পাগ্‌লি ! ভাঙা ঘড়িটার চাবি ধ'রে টানাটানি করলে আর কি তা চলে ? না ভবিষ্যতে চ'লতে পারে, এই ভরসায়, তার দম্ দেওয়া কল-কব্জার সঙ্গে ফিকির খাটানো সম্ভব হয় ? এ দেহের আর বিশ্রামও হাত-ধরা নেই, কাজ করবারও শক্তি পুঁজি নেই !—কিন্তু ক'লকাতায় যদি নিয়ে যাস দিদি !—তা হ'লে এখন থেকে একটা কথা তোকে ব'লে রাখি,—অমান্য করলে আশীর্ব্বাদ মিল্‌বে না, মিল্‌বে অভিসম্পাত।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিজয়া চাহিয়া রহিল।

সুকুমার বলিল—হাঁসপাতাল ছাড়া, কলকাতার আর কোন জায়গায় আমাকে নিয়ে যেয়ো না দিদি। কপালে যদি থাকে, তো সেখানে শুয়েই আশা পুরবে। সাবধান কোরে দিচ্ছি—হুঁসিয়ার।—হাঁসপাতাল ভিন্ন কোথাও আমি যেতে চাইনে।

বিজয়া নতমুখে জবাব দিল—তোমার কোনো সাধই সাধ্যপক্ষে আমরা অপূর্ণ রাখবো না দাদা—যা তোমার আদেশ, আমরা ঠিক তাই পালন করবো।

[ ১৩ ]

# নির্ম্মল

বসন্তের প্রভাত। দূরে নারিকেল বৃক্ষের শীর্ষে আত্মগোপন করিয়া একটা কোকিল ঝঙ্কার তুলিয়াছিল—কুহু!

নির্ম্মল বারান্দায় পাইচারি করিতেছিল। সোফারের গৃহে নূতন সোফার আসিয়াছে। তথাপি সেই গৃহখানার প্রতি চাহিয়া নির্ম্মলের বক্ষ আলোড়িত করিয়া একটা নিশ্বাস পড়িল। দুই বৎসর হইল সুকুমার চলিয়া গিয়াছে। একদিন অকালে জলদোদয়ের মতই বিস্তীর্ণ মরুভূর বুকে ঝরিয়া পড়িয়া, স্নেহ-প্রেমে, অতুল চরিত্র-স্নিগ্ধতার কঠোরতার মাঝে, উত্তপ্ত বালুকা-প্রান্তরের বুকে বুকে নবসঞ্জীবনী ধারার মধু-বর্ষণ উপহার দিয়া, আবার সে কোথায় অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল! কিন্তু নৈতিক জ্ঞানের যে সামান্য ছাপ নির্ম্মলের উপর রাখিয়া গেল, তাহাতে নির্ম্মল নবীন জীবনে চৈতন্য ফিরিয়া পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেছে! পাপে ঈদৃশ ঘৃণা ত আর কখনো কাহারও নির্ম্মল দেখে নাই! ...আজ বেড়াইতে বেড়াইতে সেই কক্ষ-দ্বারে দৃষ্টি পড়িতেই, নির্ম্মলের মনে হইল—সেই দিনের কথা! কী ব্যথাই না প্রাণে লাগিয়াছিল! কিন্তু



সুকুমার ও মলিনা।—সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়তে হবে।

আজ তাহা সহিয়া গিয়াছে। সেদিন মনে হইয়াছিল, এ বুঝি সহা যাইবে না। অসুস্থ শরীরে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মনে কত অভিমান! দাদা আসিয়া সাধিলেও কথা কহিব না। বেলা বাড়িল, অভিমান আপনিই কোথায় চলিয়া গেল। রুগ্ন দেহে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল—বন্ধ দুয়ার! কোথায় তার দাদা!···বদ্ধদ্বারে চাবি ঝুলিতেছে!······

তারপর কত দিন, কত নিশি, কত দণ্ড, কত পল, কত অনুপল অতীতের কাল-সাগরে মিলাইয়া গেছে,—চির আকাঙ্ক্ষিত দাদা সুকুমার আর আসিল না! নির্ম্মলের অনন্ত ভক্তি-ভালবাসা তাহাকে বাঁধিতে পারিল না!···

সুকুমার চলিয়া গেল, সে আজ দুই বৎসরের কথা। কেন গেল, কোথায় গেল, কিছুই জানা গেল না। এক বস্ত্রে, সমস্ত ফেলিয়া—এমন কি পাঠ্যপুস্তক অবধি!—সে পুস্তক দেখিয়া তাহারা বুঝিয়াছিল, সে সায়েন্সে এম্-এসসি পড়িত।

পিতাও কত অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বিজয়ার বিবাহের সময় রাধারমণ সেন আর একবার শেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ফল! কোনও সংবাদই পাওয়া যায় নাই। আজ সেই সমস্ত পুরাতন কথা নির্ম্মলের মনে পড়িতেছিল। মনে পড়িতেছিল—তাহার পিচ্ছিল পথে গমন, সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় সুকুমারের শুভাগমন, তাহাকে কত স্নেহে—তিরস্কার মাত্র না করিয়া, কী অনুপম উপদেশেই না সুকুমার তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল! সুকুমার তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল. "নির্ম্মল, আমি তোমায় নির্ম্মলই দেখ্‌তে চাই।"

মনে মনে ডাকিল—দাদা,—সুকুমার দাদা! কি হোলো তোমার—নির্ম্মলের, তাও কি একবার দেখতে ইচ্ছা করে না তোমার? কেমন কোরে এমন নিষ্ঠুর হলে দাদা?…নির্ম্মলের চক্ষে জল আসিল! মনে হইল—তাঁর জীবন একটা রহস্যে ঢাকা। কি জানি কী সে রহস্য!

এমনি সময়ে দ্বারবান্ হরিকিষণ সিং একখানা পত্র আনিয়া তাহার হস্তে দিল। পত্র দেখিয়া নির্ম্মল বিস্মিত হইল। বলিল—এ চিঠি কে এনেচে হরিকিষণ?

দ্বারবান বলিল—একজন পিয়ন, ব'ললে পটলডাঙ্গার মেডিকেল কলেজ থেকে আসচে।

নির্ম্মল বলিল—ডাক ত তাকে?

পিয়ন হাজির হইলে, নির্ম্মল তাহার খাতায় সহি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ চিঠি তোমাকে কে দিলে?

পিয়ন বলিল—একটি বাবু। তিনি রুগীটির কাছে আজকাল রাত্রে থাকেন।…পিয়নকে বিদায় দিয়া, নির্ম্মল পত্র খুলিয়া দেখিল, অপরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা—ইংরাজী হরফে—

প্রিয় মহাশয়,

আমাদের কলেজে, ৫নং গৃহের অধিকারী রোগীর কথানুযায়ী আপনাকে জানাইতেছি, তিনি মুমূর্ষু, জীবনের আশা আর নাই। আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। শীঘ্র না আসিলে সাক্ষাতের আশা নাই।

বিনীত—

শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নির্ম্মল স্তম্ভিত ! নিশ্চল ! কে-এ মুমূর্ষু আমাকে দেখিতে চাহে ? আমি তাঁর কে ? তারপর চিঠির শিরোনামাটা ভাল করিয়া দেখিয়াই আর অপেক্ষা করিল না। মোটর লইয়া চলিয়া গেল। হরিকিষণকে বলিয়া গেল—আমি পটলডাঙ্গায় ডাক্তারি কলেজে যাচ্ছি। কখন ফিরবো তার ঠিক নেই।

# আর কেন মিছে আশা

কলিকাতায় পৌঁছিয়া প্রভাসচন্দ্র, সুকুমারকে নিজ বাটীতেই লইয়া যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল। কিন্তু সুকুমারের এককথা—হাঁসপাতালই আমার উপযুক্ত ঠাঁই।

অগত্যা বিজয়া সাশ্রুনেত্রে সুকুমারকে হাঁসপাতালে রাখিয়া, স্বামী-ভবনে যাইতে বাধ্য হইল। সুকুমারকে সে অত্যন্ত বেশীরকম চিনিতে পারিয়াছিল। সমস্ত অন্তরের সকল প্রেরণা দিয়াই চিনিতে শিখিয়াছিল, তাই জোর-জুলুম বা অনুরোধ-আব্দার দেখাইবার ব্যর্থ প্রয়াস সে করে নাই। এমন কি, বিদায়ের ক্ষণে, সুকুমার যখন তাহার হাত ধরিয়া বলে—বিজু! দিদি! আমার একটা সব চেয়ে বড় অনুরোধ আছে ভাই! সেটি তোমায় রাখতেই হবে।...আমি যে হাঁসপাতালে পীড়িত হ'য়ে রইলাম—এ খবর যেন ঘুণাক্ষরেও অন্য লোকের কানে না যায়। আমার দুর্গতি নিয়ে আমিই ভুগ্‌বো। অন্যকে কষ্ট দেওয়ার পাপ সঞ্চয় করতে এতটুকু সাধ আমার মনে নেই ভাই!...শপথ করো—কারুকে ব'লবে না!

বিজয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমন খামখেয়ালী অথচ একজেদী পুরুষ সে আর কখনো দেখে নাই। কহিল—কারুকে সংবাদ তো দেব না, কিন্তু তোমার ক'লকাতায় আস্‌বার আসল কারণটা তো আমাদের বলনি দাদা?

সুকুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিল—ওরে বিজু! যত পারিস অভিমান

কোরে নে। এর পর আর তো পাবিনি ভাই !···কানের কাছে যমপুরীর নহবৎ বাজ্‌চে। যেতে আমাকে হবেই। কিন্তু কি বল্‌লি ?—আস্‌বার আসল কারণ বলিনি ?···ব'লেছিলাম ভাই !—যা ব'লেছিলাম,—সত্যিই। নিমুকে দেখতেই আমার এতদূরে আসা। ওরে! মানুষের সাধ যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। নইলে পথের কষ্টও আমাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে নি। যদি যাতনা সইতে না পেরে পথের মাঝে রেলগাড়ীতেই আমার মৃত্যু হ'ত,—কোথায় থাক্‌তো—নির্ম্মলের মুখ দেখার বাসনা ?···

বিজয়া কহিল—তবে হাঁসপাতালে এলে কেন ? তোমাকে পর ভাব্‌বার ইচ্ছা তো একটা দিনও আমাদের কারুর মনে জাগে নি, তোমার যে এই ক'লকাতা সহরেই চাঁদের হাট বসানো রয়েচে অথচ একা হ'য়ে তুমি চ'লে এলে—আজ হাঁসপাতালে শেষ বিছানা পাত্‌তে ! কেন—কেন ? একি আমাদের অজ্ঞাত দোষের সাজা দিচ্ছ দাদা ? কিন্তু বোলে দাও—ও চরণে কী দোষে দোষী আমরা !—অন্ততঃ আমি।

সুকুমার দেখিল—বিজয়ার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা উত্তেজনার হাওয়ায় জাগিয়া উঠিতেছে ! কহিল—বিজয়া ! প্রথম দেখার পর থেকেই তোমায় আমি বুদ্ধিমতীর শিরোমণি বলে জান্‌তাম। কিন্তু আজ তো দেখলাম—বুদ্ধি তোমার বিন্দুমাত্রও নেই। পর যদি ভেবে থাকি, তা হলে সংক্রামক রোগ বুকে পুষে নিয়ে, আজ সংসারের সব আশা-ভালবাসার অতৃপ্ত প্রণয়ী তোমরা, অন্ততঃ তোমাদের মঙ্গল আশাতেই আমার পশ্চিম থেকে ক'লকাতা আসার ভরসা ত্যাগ করতে হ'ত। কিন্তু ভাই কি বোনকে শুশ্রূষার ভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে বিজু ? না যাকে

সন্তান রোগের ছোঁয়াচ লাগ্‌বে ব'লে কাছে ঘেঁস্‌তে দেয় না? আপন ভেবেই তো কাঁধে চেপে এতখানি চ'লে এসেচি ভাই!…আমার প্রতিজ্ঞা—এ জীবনে আর কারুর দ্বারস্থ হবো না; সুখে থাক্‌লে রাজা হ'য়ে থাকৃতে পারতাম দিদি। চাকর ছিলাম, কিন্তু ইচ্ছা হ'লে—এখনো একশো চাকর আমার হুকুমের অপেক্ষায় ম'রতে বাঁচতে পারে

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি এমন প্রতিজ্ঞা দাদা? যার মান্য রাখতে আপন জনকে দাগা দিতে হয়?

উচ্ছ্বসিত আবেগে সুকুমার বলিয়া উঠিল—শুন্‌তে চেয়ো না ভাই! রূঢ় সত্য কথা। হয়তো বুকে বাজ্‌বে; তা ছাড়া ঐটুকুই তো আমার নয়, আরো আছে—

—কি?

—প্রতিজ্ঞার আসল কারণ, মৃত্যুর সামান্য পূর্ব্বে যদি শক্তি থাকে, তো একমাত্র নিমুকেই জানিয়ে যাবো, অন্য কাকেও নয়।

অভিমানে বিজয়ার ঠোঁট দুইটি ফুলিয়া উঠিতেছিল।

এতক্ষণ প্রভাসচন্দ্র নীরবে বসিয়া ছিল। এবারে সে বাস্তবিকই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। কহিল—মনের কথা একান্ত আপন ছাড়া প্রকাশ করা চলে না। কিন্তু বিজয়াকে কি আপনার 'পর' মনে হয় সুকুমার বাবু? ও বেচারা কিন্তু 'সুকুমারদা' বল্‌তে অজ্ঞান! এমন কী আপনার নিগূঢ় কথা—যা মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত ছাড়া বলা চলে না? তাও আবার নির্ম্মল ছাড়া অন্য কেউ শুন্‌বে না?

সুকুমার প্রশান্ত হাসি হাসিল। কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াই থামিয়া গেল। মুখ দিয়া তার রক্ত উঠিতেছিল।

বিজয়া তাড়াতাড়ি মুছাইতে যাইবে, প্রভাস তাহার হাত চাপিয়া কহিল—খবরদার! হাঁসপাতালে নার্সের অভাব নেই।

বিজয়া দাঁতে দাঁতে চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।…চোখে তার অবাধ্য অশ্রু-প্রবাহ গণ্ডদ্বয় সিক্ত করিয়া দিতেছিল।

প্রভাস কহিল—চলো বাড়ী যাই। মিথ্যে পাগলামী কোরে কেন যে এত কষ্ট পাচ্ছ বিজয়া!—অথচ উনি নির্ব্বিকার!…বুঝলেন সুকুমার বাবু—সংসারে যতক্ষণ সজ্ঞানে বেঁচে থাকবেন, ততক্ষণই লোক-লৌকিকতা আর কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনাকে আইন-কানুন মেনে চলতে হবে।

দু'হাত যোড় করিয়া সুকুমার কহিল—মার্জ্জনা করুন ব্যারিষ্টার সাহেব! আমার কথা বাস্তবিকই বিজয়ার শোনা উচিত নয়। নইলে মনে রাখবেন—আমারই স্বার্থের জন্য সোদরাধিকা বিজয়াকে আমি এমন কোরে ব্যথা দিতে চাইতাম না। অজ্ঞান শিশু, আগুনের চাক্‌চিক্যে ভুলে স্পর্শ করতে যায়, কিন্তু মা-বাপে কি তার আবদার রাখে কখনো?

বিপুল বিস্ময়ে প্রভাসচন্দ্র সুকুমারের ক্লান্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এই মরণাহত রোগীকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিয়া আর জ্বালাতন করিতে তার অভিপ্রায় হইল না।

সুকুমার সস্নেহে বিজয়ার কাঁধে হাত দিয়া বলিল—বড় ভাল বেসে-ছিলে বিজু!……মায়ের পেটের ছোট বোন্‌টি আমার! ঘরে ফিরে যাও। মৃত্যু হলেও তো শ্মশানে দিয়ে আসতে হ'ত!…ফিরে পাওয়ার বস্তু তো আমি নয় ভাই! যাও—বাড়ী যাও।

বিজয়া অনেকক্ষণ নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ উঠিয়াই সুকুমারের পদধূলি মস্তকে লইতে লইতে সজলনয়নে গাঢ়স্বরে বলিল—আমায় আশীর্ব্বাদ করো দাদা!

পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসের সহিত সুকুমারের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল—"শান্তি পাও,—স্বামী-গৌরবে সুখ লাভ করো।"

আর কোন কথা না বলিয়া, বিজয়া স্বামীর সহিত বাড়ী ফিরিয়া গেল।

সুকুমার রহিল—দুরারোগ্য ব্যাধির সহিত যুদ্ধ করিতে একা। হাঁসপাতালের প্রশস্ত হল-ঘরটীতে শেষ বিছানা পাতিয়া তাহার কেবলই মনে হইতেছিল—এ সাধ তার কেন হইল? জগতে যাহা কিছু বাঞ্ছা করিবার, সে তো বিধাতার নিকট হইতে সমস্তই প্রচুর পাইয়াছিল, তবে কেন এ বিধি-বিড়ম্বনা, কেন এই অদৃষ্ট-বৈগুণ্য!……কিন্তু তার সকল চাওয়াই কি সফলতা-গৌরবে অম্লান আছে? অভিশপ্ত এ ভাগ্যফল,—চিরবাঞ্ছিত এই জনকোলাহলের মমতা—এ যে জীর্ণপরাণের দাহিকা! হায়রে—আজ যদি স্মৃতি লুপ্ত হইত! চিন্তাশক্তি বিস্মৃতির আহ্বানে আপনাকে ধরা দিতে শিখিত!……

কঙ্কালাবশেষ—কম্পমান বক্ষের উপর শীর্ণ হাত দুখানি রাখিয়া, সুকুমার সজল-চোখে প্রার্থনা করিল—নারায়ণ! হে অন্তর্য্যামী পরম পুরুষ! অন্তরের ব্যথার কথা তো তোমার এতটুকু অবিদিত নাই প্রভু! শান্তি চাইবার স্পর্দ্ধা আমি কখনই রাখি না, নিকৃষ্ট হীনাদপি অস্পৃশ্য যে, তার আবার দেব-দেউলের ধূপ-ধূনার গন্ধে কি অধিকার? আজ শুধু এইটুকু কোরো প্রভু!—শেষের নিশ্বাস ব'য়ে না যেতে যেতেই

যেন হতভাগী মায়ের চরণ বুকে ধরতে পাই। আবর্জ্জনাকে যে চন্দনের মতই সাদরে গায়ে মেখেছিল, লাঞ্ছনাকে যে প্রশংসার সমান গণ্য ক'রেছিল, লোকালয়ের পবিত্রতা যার কাছে আকাশ-কুসুম,—সেই চির-বরেণ্যা মমতাময়ী মাতার শ্রীচরণ দর্শনের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত যেন আমার চেতনা রেখো দয়াময়!—এ ছাড়া...আর নির্ব্বাণ যেন আসে!...দানের ফুলভারে সে আমায় ক্লান্ত করে রেখেচে, আজ পরিচয়ের বোঝায় তার কচি মাথাকে আমিও যেন শ্রান্ত কোরে দিতে পারি।...তারপর...তারপর—কোথায় ওগো আমার চির অমলিন মলিনা! এ-পারের আদরিণী ছিলে, এখন হয়েছ—পরপারের কামনার ধন,—দাও তোমার অনন্ত শক্তিঢালা হৃদয়ের প্রেরণা, তোমার স্বর্গ-সুখের বার্ত্তা পাঠাও,—আমি তোমারই দর্শন ভিক্ষার জন্য লালায়িত হয়ে, দিন-যামিনী মরণের কাছে স্পর্শ-সুখ যাচ্ঞা করছি। হে করুণাময়ী! দেখা দাও! আমার জ্ঞানে, অজ্ঞানে, শোকে, আনন্দে, জীবন-মৃত্যুর মহা দ্বন্দ্বের মাঝে আজ মূর্ত্ত হ'য়ে দেখা দাও!...ওগো প্রিয়া! ওগো সকল সুখ-দুঃখের একীভূত লক্ষ্য! দাও দাও—দেখা দাও!...মৃত্যু উপহার পেয়ে আমি বাঁচি আজ!

[ ১৫ ]

## পুরস্কার না তিরস্কার ?

সুকুমার চলিয়া যাওয়ার পর হইতে, রাধারমণ সেন আর কীর্ত্তন পদাবলী কানে শোনেন নাই। গোবিন্দদাস বাবাজীর গান তাঁর মোটেই ভাল লাগে না। এমন কি বিস্তর খ্যাতনামা কীর্ত্তন গায়ক-গায়িকা আসিয়াও তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে পারে নাই। আজ-কাল প্রায়ই নির্জ্জনে বসিয়া হরিনাম করেন, অন্তর্নিহিত চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে হাতের মালা ছড়াটা ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে থাকে।

শুধুই কর্ত্তার কথা নয়, গৃহিণী পর্য্যন্ত সদা ম্রিয়মাণ! বাড়ীর দাস-দাসী হইতে ছেলে-মেয়ে, কর্ত্তা-গৃহিণী কেহই সবিশেষ সুখী ছিল না। সুকুমার, সুচরিত্রের মাধুর্য্য ছড়াইয়া এই সুখী পরিবারের মাঝে এতখানি আসন বিছাইয়া গিয়াছে!…

সামান্য একটুখানি বেলা হইতেই, কর্ত্তা রাধারমণ গৃহিণীর নিকটে আসিয়া বলিলেন—ওগো! চলো দিনকতক তীর্থ বেড়িয়ে আসি। ক'লকাতায় আর ভাল লাগে না।

গৃহিণী বলিলেন—যা ইচ্ছে হয় করো, আমি তোমাদের সাতে পাঁচে নেই আর। পরের ছেলেকে আপন কোরতে চেয়েছিলাম, তুমি মত দাওনি। আজ তারই ব্যথায় দিনরাত্তির অশান্তি ভুগ্‌চি। তোমার তীর্থ বেড়ানোর ছল্—সেকি আমার বুঝ্‌তে বাকি আছে ভেবেচ? কিন্তু শান্তি তোমার অদৃষ্টে নেই। আমার বড় আশায় জল ঢেলে দিয়েচ।—

রাধারমণ ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া কহিলেন—মিছে অভিমান কোরো না গিন্নী। আগেই তো ব'লেছিলাম—সমান গোত্রে বিয়ে হয় না। হিঁদু হ'য়ে অশাস্ত্রীয় কিছু করা কি উচিত হ'ত? তা ছাড়া প্রভাসের সঙ্গে বিয়ে হ'য়েও তো বিজয়া অসুখী হয়নি?

গৃহিণী বলিলেন—ঐ যে দোহাই দিলে হিঁদু হয়ে, অশাস্ত্রীয় করা উচিত নয়,—এও তাই। স্বামী বলে তাকে যার হাতে তুলে দিয়েছ,—সে তারই মন যুগিয়ে চল্‌তে বাধ্য। হিঁদুর মেয়ের বুকে কুলকাঠের আগুন জ্বলে, কিন্তু স্বামীর সুখের জন্যে মুখে তার মধু-বর্ষণ হয়··· কিন্তু নিমু মোটরে কোরে হঠাৎ বেরিয়ে গেল কেন—জানো?···বিজুদের ফিরে আসার কথা ছিল,—এলো না কি?

উদাসকণ্ঠে রাধারমণ বলিলেন—হবে। তা হ'লে কি ক'রবে? যাবে—দিনকতক বিদেশ দিয়ে ঘুরে আস্‌তে?

গৃহিণী জবাব দিলেন—যা হুকুম হবে, তামিল করতেই বাধ্য থাক্‌বো। আর কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না। সুকুমার, নির্ম্মলকে পর্য্যন্ত এমন বশ ক'রে রেখে গেছে,—ছেলের মনে কি যে হয় জানা যায় না, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। যেতে হ'লে নিমুকেও সঙ্গে নিতে হবে।

তারপর কর্ত্তা-গৃহিণীর আর কোন বিশেষ কথাবার্ত্তা হইল না গৃহিণী গঙ্গাস্নানে যাইবার আয়োজন করিতে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

আরো আধঘণ্টা পরে, গৃহিণী গঙ্গাস্নানে প্রস্থান করিলে দারোয়ান সংবাদ দিল—একটি বাবু দেখা করিতে চাহেন ······

কর্ত্তা দ্বিতলেই বসিবার ঘরে বসিয়া আগন্তুকের অপেক্ষা করিতেছিলেন।—

এমনি সময় সুকুমারের সেই 'শশধর দা' আসিয়া রাধারমণকে নমস্কার করিল।

রাধারমণ বিস্ময় বোধ করিলেন অনেকখানি। জিজ্ঞাসা করিলেন —আপনি কোথেকে এসেছেন? আগে তো কোন দিন দেখিনি?

শশধর বিনীত ভাবে কহিল—আপাততঃ আমি কাশী থেকে আসছি। কলকাতাতেও থাকি মাঝে মাঝে।

—আমার সঙ্গে দরকার আছে?

—আজ্ঞে; নইলে আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত দিতাম না।

—কি দরকার বলুন?

—'সুকুমার' নামে কোন যুবা আপনার বাড়ীতে চাকরী করে?

বিস্মিত রাধারমণ জবাব না দিয়া বিহ্বল নেত্রে শশধরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

শশধর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—করে?

—'না, বলিয়া রাধারমণ বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

শশধর পুনরায় প্রশ্ন করিল—এম-এস্‌সি পড়তো, সুন্দর, প্রিয়দর্শন যুবা, অতি নির্ম্মল চরিত্র, নাম সুকুমার সেন,...চাকরী করে না?

রাধারমণ জবাব দিলেন—না বাপু।

উত্তেজিত শশধরের কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—আমাকে মাপ ক'রবেন মশায়! যতই অপরিচিত হোন্—তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি—আপনি সত্য গোপন ক'রছেন।

অন্য সময় হইলে রাধারমণ ক্রোধে জ্ঞান হারাইতেন। কেননা, তিনি

ধর্ম্মময় জীবন যাপন করিতেন, সত্য-গোপনের মহাপাপ তিনি কখনই অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন না। আজ কিন্তু শশধরের এই তীব্র অথচ ভদ্র ভর্ৎসনায় তাঁর মনের মাঝে বিরক্তির পরিবর্ত্তে রাজ্যের গ্লানি আসিয়া জমা হইয়া গেল। বলিলেন—আপনি আমায় ভুল কোরে তিরস্কার ক'রছেন মশায়!···'সুকুমার' চাকরী করতো, এখন আর করে না।

শশধর কহিল—তা হ'লে মাপ ক'রবেন। আপনাকে প্রকারান্তরে আমি মিথ্যাবাদী ব'লেছি। তার আসল কারণ হচ্ছে—সুকুমার নিজেই একদিন আপনার এখানে তা'র চাকরী করার কথাটা বলে এসেছিল। দেবতা মিথ্যা কইতে পারে কিন্তু সুকুমারের স্বভাবে আমরা কখনো জানি না যে, সে সত্য গোপন করেছে।

রাধারমণের নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন —সুকুমারের সঙ্গে আপনার কোন সম্বন্ধ আছে?

—সে আমায় 'দাদা' বলে ডাকে।

—এখন সে কোথায় আছে জানেন?

—জানি না ব'লেই তো আপনার বাড়ীতে আসতে হ'ল। আমরা খবর পেয়েছি—সে অসুস্থ হয়ে কলকাতায় এসেছে।··হাঁসপাতালে থাকবারই অভিপ্রায় জানিয়েছিল। কিন্তু ক'লকাতায় হাঁসপাতাল তো একটা নয়, কোথায় আছে বা আপনার এখানেই আছে কি না, এই সমস্ত জানবার জন্যেই···

—বাবা!

শশধরের বাক্য অসমাপ্ত রহিয়া গেল। ঘরের পার্শ্ব হইতে কে ডাকিল—বাবা!

রাধারমণ কহিলেন—কে বিজু?…এসেচিস মা? তা—তা এই ঘরেই আয় না!…ইনি আমাদের সুকুমারের আত্মীয়।

সুকুমারের প্রস্থানের পর রাধারমণ যেন বাস্তবিকই তাহার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন, নতুবা আজ অতি অপরিচিত শশধরকে সুকুমারের আত্মীয়রূপে উপস্থিত জানিয়াও, মেয়ে বিজয়াকে, তিনি এইখানেই আসিতে বলিতেন না। একদিন এই রাধারমণই নির্ম্মলের ইচ্ছাসত্ত্বেও প্রথমতঃ সুকুমারের অন্তঃপুরে আসার বিরোধী ছিলেন।

বিজয়া অধুনা ব্যারিষ্টার গৃহিণী, সুতরাং পাশ্চাত্ত্য-ভাবাপন্না, তাই সহজেই শশধরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিল।

কন্যার বিষণ্ণবদন এবং অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য দেখিয়া রাধারমণ চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—শরীরটা কি ভাল নেই বিজু?

বিজয়া অধোমুখে জবাব দিল—বেশ আছে বাবা।

—তবে অমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন?…কবে এলি? আজ না কাল?

বিজয়া—এসে, এখনো বাড়ী যাওয়া হয় নি।…

ব্যস্ততার সহিত রাধারমণ উঠিতে উঠিতে বলিলেন—বরাবর এ-বাড়ীতেই এসেছিস্?…তাই বল্—পাগ্‌লি মেয়ে কোথাকার! প্রভাস একলা রয়েচে,—নিমু নেই বাড়ীতে।…চল্ দেখি।

বিজয়া বলিল—আপনাকে উঠতে হবে না বাবা। আমি একাই এলাম।…আমি এখন মেডিকেল-কলেজ থেকে আস্‌চি।

অধীরকণ্ঠে রাধারমণ বলিয়া উঠিলেন—কি সর্ব্বনাশ! মেডিকেল কলেজ থেকে?—কেন? প্রভাস কোথা? সে ভাল আছে তো?

বিজয়া কহিল—আমরা সবাই ভাল আছি বাবা। কেবল আমাদের সুকুমার দা' মর-মর। তাঁকেই মেডিকেল কলেজে রেখে, দাদাকে নিতে এসেচি।...দাদাকে দেখবার জন্যেই তিনি এখনো বেঁচে র'য়েছেন। বলিতে বলিতে বিজয়া দুহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ইহারই মধ্যে শশধর কোন্ ফাঁকে উঠিয়া গিয়াছে—রাধারমণ বা বিজয়া কেহই লক্ষ্য করেন নাই।

রাধারমণ বিজয়াকে রুদ্যমানা দেখিয়া, মনে মনে অনেকখানি আত্ম-গ্লানি অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার বেদনাতুর কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—সুকুমার মর মর! ...তাকে কোথায় পেলি বিজয়া?

—পশ্চিমের একটা ছোট্ট সহরে। সেখান থেকে তাঁরই ইচ্ছায় মেডিকেল কলেজে নিয়ে এলাম।

—কেন বাড়ীতে আনতে পারিলি নি?...আমরা তো তাকে 'পর' ভাবতাম না মা!...একদিন তারই দয়ায় তোর বাপের জীবন রক্ষা হ'য়েছিল, আজ তাকে কী বিবেচনায় হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করে দিয়ে এসেছিস্ বিজয়া? কর্ত্তব্য কি এম্‌নি করেই পালন করে মা?

অভিমান-বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বিজয়া জবাব দিল—সুকুমারদা'র আদেশ পালনই আমি সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য ভেবেছিলাম বাবা। তাই তাঁর ইচ্ছাতেই মেডিকেল কলেজে রেখে এসেচি। বাড়ীতে তিনি আসতে চাইলেন না।

রাধারমণ মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কিসের অভিমান! অভিমানী এই তরুণ আজ কিসের গূঢ় অন্তর্নিহিত বেদনায় প্রপীড়িত হইয়া, হাঁসপাতালে মরণকে বরণ করিতে আসিল!

রাধারমণের স্মৃতিসিন্ধু উথলিয়া উঠিল !—তরঙ্গের পর তরঙ্গ···উত্তাল বীচিবিক্ষুব্ধ অসীম বারিধির বুকে প্রলয়ের তুফান উদ্দাম নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে !···নিগূঢ় এই ভীষণ সমস্যার সমাধান করিবার কোন উপায়ই কি হাতের কাছে পাওয়া যায় না আজ !···

রাধারমণ গৃহমধ্যে উন্মত্তের মতই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন—

বিজয়া বলিল—দাদা কোথায় গেছে বাবা ? তাকে যে এক্ষুনি আমার চাই ! সুকুমারদাকে আমি বড় আশা দিয়ে রেখে এসেচি যে !

রাধারমণ কথা কহিলেন না। বোধ হয় কহিতে পারিলেন না।

শশধর পুনরায় ফিরিয়া আসিল। শশধরের কথা যেন রাধারমণ এতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত ছিলেন। কহিলেন—যাও বাবা ! তোমাদের সুকুমার মেডিকেল কলেজে মর-মর।

বিনীতভাবে শশধর কহিল—আজ্ঞে তাই যেন শুনলাম। কিন্তু আপনার কাছে বিদায় না নিয়ে যাওয়াটা অভদ্রতা হয় বলেই, আবার ফিরে এসেচি। বলিয়া একখণ্ড কাগজ রাধারমণের হাতের উপর তুলিয়া দিয়াই, বিনা বাক্যব্যয়ে শশধর দ্রুত প্রস্থান করিল।

স্তম্ভিত রাধারমন কাগজখানা তাড়াতাড়ি খুলিয়া, গুটিকতক লাইন পাঠ করিয়াই একান্ত শোকার্ত্তের মত ঘরের মেঝেয় বসিয়া পড়িলেন।

বিজয়া কাছে আসিলে অসহায়ের মত বলিলেন—আমাকে সেখানে নিয়ে চল্ বিজু—আমি যাবো—যাবো সেখানে। ওরে, সুকুমার যে··· না না বিজু—মা আমার !···আমাকে সেখানে নিয়ে চল্ মা ! নিয়ে চল্!

ভয়ে ভয়ে বিজয়া পিতার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ···কাগজখানায় কি লেখা আছে বাবা ?

অস্থিরভাবে রাধারমণ আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিলেন—কিছু নেই—কিচ্ছু নেই বিজয়া !···সব আছে—সব আছে মা !···কাগজে সব আছে—তোর বাপের মৃত্যু-পরোয়ানা আছে।

—কিন্তু কে লিখ্‌লে বাবা ?···কি লিখ্‌লে ?

—জানি না বিজয়া—জানি না।···বাপ হয়ে মেয়ের কাছে আর কত ভিক্ষা চাইবো বিজু ?—আমাকে নিয়ে যাবি না ?······

বিজয়া তবু ভয়ে ভয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—চিঠিখানা কে লিখেচে বাবা ?

রাধারমণের স্খলিত কণ্ঠ অতি নিম্নস্বরে উচ্চারণ করিল—'সুকুমারের মা !'

---

[ ১৬ ]

# নিষ্পাপ

শেষ রাত্রে জ্বর নামিতেছে—অতি দ্রুত। যে ছাত্রটী নাইট-ডিউটিতে ছিল, সে ক্ষণে ক্ষণে উত্তাপ দেখিতেছে ও চঞ্চল চক্ষে দ্বারের প্রতি চাহিতেছে। এখনি ডাক্তারসাহেব আসিবেন। সুকুমারের চৈতন্য ফিরিয়া ছিল, শুশ্রূষাকারী যুবার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বলিল—জ্ঞান বাবু! আর বেশী দেরী নেই, না? নিমুর সঙ্গে দেখা হলো না।...মাগো, অযোগ্য সন্তান, ক্ষমা কোরো। সুকুমার দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হাঁপাইতে লাগিল।

ছাত্রটি বলিল—না না, আপনি ভাবছেন কেন? এক্ষুনি ডাক্তার-সাহেব আসবেন, এলেই যন্ত্রণা ক'মে যাবে।

সুকুমার অতি মৃদু হাসিল, মৃদু অস্ফুট স্বরে বলিল—বড় যন্ত্রণা জ্ঞান বাবু, এ আর সহ্য হয় না যে!

যুবা ছাত্রটি নীরবে বসিয়া রহিল, সেই সময়ে ডাক্তারসাহেব আসিলেন। পরীক্ষান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—এমন অবস্থা কখন থেকে?

ছাত্র বলিল—শেষ রাত্রি থেকে।

ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, দন্তে পেন্সিল ধরিয়া, হস্তদ্বয় পশ্চাতে বদ্ধ করিয়া রোগীর প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুকুমার চক্ষু চাহিল, পরিষ্কার ইংরাজীতে বলিল—সাহেব ! আপনাকে ধন্যবাদ, আপনারা আমাকে শাস্তি দিবার অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আজ আমার শেষ দিন, আমার একটা উইল করবার ইচ্ছে আছে, যদি অনুগ্রহ কোরে আপনি কিছু সাহায্য করেন—

সাহেব বলিলেন—বলুন, কি আপনার ইচ্ছা ?

সুকুমার বলিল—আমার—একখানি বাড়ী আছে—এই কলকাতাতেই রতন মিত্রের গলিতে…৮নং বাড়ী। তা'ছাড়া সামান্য টাকাকড়িও আছে, তা আমি আমাদের দেশের পতিতা নারীদের দিয়ে যেতে চাই, সামান্য বুদ্ধি ভ্রমে যারা চরিত্র হারিয়ে, আজীবন নরকে প'চে মরে,—এ টাকা তাদের কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হবে। গভর্ণমেণ্টের জিম্মায় টাকাটা রেখে যাবো। যে কেহ, কোন সম্ভ্রান্ত লোক দ্বারা দরখাস্ত করলেই কিছু কিছু পাবে। যদিও এ সামান্য, তবু যদি একজনও পাপ পথ থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারে।

ডাক্তার বলিলেন—উত্তম সংকল্প, আমি এক্ষুনি একজন উকিলকে সংবাদ দিচ্ছি।

সুকুমার বলিল—কিন্তু খুব শীগ্‌গির ডাক্তারসাহেব। আমার সময় নিকট।

ডাক্তারসাহেব তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

সুকুমার বলিল—জ্ঞান বাবু, কতক্ষণ আর বোসে থাকবেন ? আপনি বাড়ী যান।

যুবা ছাত্রটী বলিল—আর একজন এলেই আমি যাব, আপনি এই ওষুধটা খেয়ে ফেলুন তো।

সুকুমার মুখ ফিরাইয়া বলিল—দিন, আমি কিছুক্ষণও বেঁচে থাকতে চাই, একবার নিমুকে দেখ্‌বো। আর—মা,···মা যদি আসেন!

—"আসবেন বইকি, দু'জনেই এখনি আস্‌বেন।" বলিয়া যুবা তৎকালীন ঔষধটি সেবন করাইয়া দিয়া, গ্লাসটি বেঞ্চের উপর রাখিতে গেল। দেখিল শ্বেতবর্ণের বিশাল মোটরকার অতি বেগে ছুটিয়া ফটকে প্রবেশ করিল। তা'রপর বারান্দার নিম্নে আসিয়া, একটী রূপবান্ যুবা ত্রস্তে দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিল—৫নং ঘর কোনটা? দ্বারবান্ দেখাইয়া দিলে যুবা দ্রুতপদে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যাশায়ী সুকুমারকে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল—দাদা—দাদা। সুকুমার দাদা! একি—একি দেখ্‌চি। এই দেখবার জন্যে কি আমায় ডেকেছ? এতদিনে মনে পড়লো—তোমার নির্ম্মলের কথা?·· নির্ম্মল মুমূর্ষুর মুখে মুখ দিয়া শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল।

সুকুমার চক্ষু চাহিল, নিজের অশক্ত দুর্ব্বল উভয় বাহু দিয়া নির্ম্মলকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। বলিল—নিমু এসেছো? আঃ। আমি জানতাম তুমি আস্‌বে। বোসো, কিছু বলবার আছে আমার।

নির্ম্মল বলিল—দাদা, কত অসুখ হয়েচে, কত কষ্ট পেয়েছ, আমাকে কেন জানাও নি? হাঁসপাতালে এলে কেন? কেন এলে? আমি কি তোমার কেউ নই? এতটুকুও ভালবাসো না কি আমায়?

নির্ম্মল কাঁদিতে লাগিল। সুকুমার অশ্রু মুছিয়া বলিল—উঠে বোস্ নিমু, একটু দূরে সরে বোস্।—তোর মুখখানি যাতে শেষ অবধি দেখতে পাই!

নির্ম্মল আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সুকুমার বলিল—কেঁদোনা

ভাই, চুপ কর। আর কতক্ষণ কথা কইবো জানি না, যা বোল্‌তে চাই তা শুনে নাও নিমু!

নির্ম্মল চক্ষু মুছিয়া সুকুমারের প্রতি চাহিল, দেখিল—সেই কন্দর্প-কান্তি দেহ, তাহার কী পরিবর্ত্তন হইয়াছে! দেখিলে আর সুকুমার বলিয়া চিনিবার উপায় নাই! তাহার সেই মৃদু-মধুর প্রাণস্পর্শী কণ্ঠস্বর আজ জড়িত—বিকৃত—অস্পষ্ট—সানুনাসিক! নির্ম্মলের উভয় চক্ষে আবার জলধারা বহিল। বলিল—অসুখ হলো কত দিন? কোথায় লুকিয়ে রইলে? ··কত খুঁজলাম—একটিবার দেখবার জন্যে······

নির্ম্মল সুকুমারের মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল। যুবা ছাত্রটীর ডিউটী শেষ হইয়াছিল, অপর যুবা প্রবেশ করিতেই সে চলিয়া গেল। নবাগত নীরবে রোগীর মণিবন্ধে নাড়ী দেখিল, লিখিত কাগজে রাত্রির অবস্থা সমস্ত জানিয়া লইয়া, পার্শ্বের একখানি কাষ্ঠাসন টানিয়া বসিল।

সুকুমার নির্ম্মলের হস্ত ধরিয়া বলিতে লাগিল—নিমু, তোমার বড় আগ্রহ ছিল—আমার পরিচয় জান্‌তে। ভাইটী আমার! সে পরিচয়ে যে কত লজ্জা, কত ঘৃণা গোপন করা আছে! তাই তো তোমাকে সব কথা জানাতে পারি নি! আজ কেন জানাচ্ছি জান? আর তো আমার লজ্জা-ঘৃণা কিছুই নেই! যাচ্ছি আজ। আর আমার দুঃখ দেখে, আমার ব্যর্থ জীবনের ব্যথা বুঝে, যদি একজনও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ পুরুষ সংযত হয়, তবু আমার সন্তপ্ত আত্মা শান্তি পাবে। কিন্তু বল্‌তে বেজায় কষ্ট হচ্ছে নিমু!—আমার সকল ইতিহাস আমি একটি একটি ক'রে কাগজে লিখে রেখেছি। বলিয়াই বালিশের নীচু হইতে প্রকাণ্ড একখানা লেফাপা বাহির করিয়া দিল। নির্ম্মল ব্যগ্র উদ্বেগে পড়িতে লাগিল—

"আমার মা একজন দরিদ্র সুবর্ণ বণিকের প্রথম বিবাহের সন্তান। মা'র মা ছিলেন না বলিয়া নৈতিক শিক্ষা পান নি। বিমাতা [illegible] দেয়, পরিশ্রম করায়, আদর করে না — বা সৎ-উপদেশ দেয় না। সেই সময় মায়ের [illegible] হয়। এক ধনীর [illegible] ছিল [illegible], ধনবানের একমাত্র [illegible] ছিল। তার লোলুপ দৃষ্টি পড়িল — সেই [illegible] হতভাগিনী কুমারীর প্রতি [illegible] প্রলোভন, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, চিরপ্রণয় প্রভৃতির মোহে দুঃখিনী দরিদ্রা কিশোরী ভুলিয়া গেল, নিজ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, পাইল — সেই [illegible] ধনী-সন্তানকে। কিন্তু আমার জন্মের [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]। অভাগিনীর, [illegible] উপর [illegible], পতি [illegible] শেষ [illegible] — উপর্য্যুপরি [illegible]। বৈমাত্র ভ্রাতা শিশু ও দরিদ্র। [illegible] ভগিনীকে গৃহে স্থান দিবার তাহাদের শক্তি কোথায়? যিনি আমার জন্মদানের দায়ী এবং ইচ্ছা করিলে আমাদের এই দুঃখ দূর করিতে পারিতেন, তিনি তাহা না লওয়ায় আমার এই [illegible] দিন রক্ষা করিবার জন্য, হতভাগিনী মা আমার বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য হন। 'কমলা বাঈজী'র নাম শুনেছ নিমু? তিনিই আমার মা।"

নিমু [illegible] পাষাণের মত [illegible] হইয়া গেল। তাহার হাত হইতে হতভাগ্য সুকুমারের পরিচয়লিপিখানা মাটীতে পড়িয়াছে, সুকুমার তাহার মাথায় আপন শীর্ণ হাতখানা রাখিয়া অতি স্নেহার্দ্র ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল — অধীর হ'য়ো না নিমু! তোমার কি দোষ ভাই? তারপর যে আরও আছে [illegible] এইবার মুখে মুখে বলি শোন —

কেন তোমাদের মধ্যে ধূমকেতুর মত এলাম, কেন [illegible] বা সেই [illegible]

ভাবে অদৃশ্য হ'লাম, সব বোলে নিই তাই!···কিন্তু শিশু-অবস্থা অতিক্রম করবার পর আমি যখন জ্ঞান পাই—তখন আমি সেণ্ট্ জেভিয়ার স্কুল-বোর্ডিংয়ে থাকি। খুব বড় মানুষের ছেলেরাও আমায় হিংসা কোরতো! মনে আছে—তুমি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে—ইংলিস-কার-গুলো চালাতে আমি কোথায় শিখি? তখন আমি কি বোলবো, তাই আর কিছু বলিনি! আমার নিজের দু'খানা ভাল গাড়ী ছিল। নিজে চালিয়ে বেড়াতাম, সোফার ছিল, তারা একশো দেড়শো মাইনে পেতো। মোটের উপর আমি যা করতাম, জেনো—কোন রাজপুত্রও তেমন করতে পারতো না; ভালোবাসতো না, এমন কেউ সেই বোর্ডিংয়ে ছিল না। ক্রমে বড় হ'তেই, নিজের পরিচয়ের জন্য কৌতুহল হ'তে লাগলো। গ্রীষ্মের ছুটীতে মা আমাকে নিয়ে দার্জিলিং চোলে যেতেন। সেখান থেকেই আবার বোর্ডিংয়ে ফিরে আসতাম। মার কাছে যদি দুই একদিন চিৎপুরে যেতাম, মাকে যেন বড় ভীত সঙ্কুচিত বোধ হোতো। বড় সন্দেহ! একদিন শশধর দাদাকে জিজ্ঞেস করি—দাদা, সবার বাবা আছেন, আমার নেই কেন? শশধর দাদাকে আমার মা বাল্যকাল থেকে প্রতিপালন কোরে-ছিলেন। সে ছিল মার পুত্রাধিক। শশধর দাদা অনেক কাঁদলেন, তারপর আমাকে একান্ত নিরস্ত কোরতে না পেরে, সমস্ত বল্লেন। নির্ম্মল! নির্ম্মল! কেন সেই দিন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়নি? আমার জীবন রক্ষার জন্য মাকে সতীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হ'য়েছিল!······আমি মূর্চ্ছা গিয়ে-ছিলাম, যখন চৈতন্য হোলো, মা'র বুকে মাথা রেখে অনেক চোখের জল ফেলেছিলাম। মা আমার বলেছিলেন—পাপের সব জ্বালা জুড়িয়ে গেছে—তাঁর—আমার স্নেহে। নিমু! নিমু! একথা কেবল অনন্ত স্নেহময়ী

হতভাগিনী মা ছাড়া আর কেউ বোলতে পারবে না। কিন্তু আমার মনে বড় ঘৃণা হোলো। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হোল না—তা হ'লে প্রায়শ্চিত্ত হবে কেমন ক'রে? কিন্তু ম'ার কাছ থেকে আব অর্থ নিতে প্রবৃত্তি হোলো না। আমার ভরণ-পোষণেব জন্য মা আমার মহাপাতক সঞ্চয় কবেছেন! আব মা'র সেই অর্থে এ-দেহ পোষণ করতে পারলাম না। তাই মা'র কাছ থেকে পালিয়ে ছিলাম, আর তোমাদের বাড়ী চাকরী নিয়েছিলাম। এম, এস্-সি পরীক্ষার আব অল্পদিনই বাকী ছিল। মনে ইচ্ছা ছিল, পরীক্ষাটা হ'য়ে গেলেই চাকরী কোরে বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে দেবো। দিয়েছিও—তাই। কেবল তোমাদের বাড়ীর ক'টা দিন স্বপ্ন দেখলাম।...নিমু! কেন তোমাদের ছেড়ে পালালাম জান? এক দিন রাত্রে শুনলাম, মা ও কর্ত্তা বিজয়ার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা বলছিলেন। মা বোল্লেন কেন সুকুমারকে বাড়ীতে রাখলে? মেয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়।...সেই দিনই তোমাদের ছেড়ে যে পালিয়েছিলাম আর মুখ দেখাই নি। তারপর এখনো যে আমায় দেখতে পাচ্ছ—এ শুধু বিজয়ার দয়ায়। আজ আমার শেষ দিন, আর বেশী দেরীও নেই! যাবার সময় আজ তোমাকে সব কথাই জানিয়ে গেলাম—আর দুঃখ কোরো না। কেবল আমার মৃত্যুর পর দুই বিন্দু স্নেহাশ্রু ফেলো, আমার সন্তপ্ত আত্মা শান্তি পাবে।

নির্ম্মল তাহার মৃত-কল্প দেহ আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল—কিন্তু তুমি কি সে পাপিষ্ঠ পিতাকে ক্ষমা করেছ দাদা?

সুকুমার মৃদুস্বরে বলিল—সর্ব্বান্তঃকরণে।

নির্ম্মল পুনরায় বলিল—কে সেই হৃদয়হীন লম্পট পুরুষ? তা'র নাম জান দাদা? এখনো সে বেঁচে আছে?

সুকুমার বলিল—তাঁর নাম জান্‌তে চেয়ো না নির্ম্মল! না জানাই তোমার উচিত।

নির্ম্মল উত্তেজিত ভাবে বলিল—না-না, তুমি আমাকে বল তাঁর নাম। না শুনে যে আমি শান্তি পাচ্ছি না!

সুকুমার বলিল—কিন্তু কি হবে জেনে নিমু? আমার তো শেষ হ'য়ে এসেচে। আমার মায়েরও তাই। অর্থ তাঁরও আর এখন আবশ্যক নাই। এখন তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে পারেন, সে সমস্তই তাঁর স্বোপার্জ্জিত।

নির্ম্মল ব্যাকুলভাবে বলিল—তবু বল, যদি কোন দিন তাঁর দেখা পাই আমি, তবে তাঁর পাপের পরিণামের জলন্ত চিত্রখানা তাঁকে দেখাবো একবার!…তুমি নামটা আমায় বল দাদা!

মুমূর্ষু বিচলিত হইয়া বলিল—কিন্তু সে নাম শুনলে তাঁকে মার্জ্জনা করতে পারবে? পিতৃভক্তি ত তোমার দৃঢ় আছে?…নির্ম্মল! নির্ম্মল! তবে শোন,—যিনি তোমার পিতা, তিনি আমারও পিতা!…ভাই নির্ম্মল! তোমাদের গৃহে আমি পুত্র হ'য়ে পিতারই দাস্য স্বীকার করেছিলাম—!

স্তম্ভিত নির্ম্মল কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় সুকুমারের হস্ত নিজ হস্তে ধরিয়া বসিয়া রহিল।…

সেই সময় আর একখানি মোটরকার অতি দ্রুত আসিয়া, বারান্দার নিম্নে থামিল ও তাহা হইতে এক বর্ষীয়সী রূপবতী নারী ও শীর্ণকায় যুবা অবতীর্ণ হইল। যুবা কম্পিত-কায়া নারীকে ধারণ করিয়া দ্বারবানের নির্দ্দেশানুযায়ী ৫ নং কক্ষে প্রবেশ করিল।

এক মুহূর্ত্ত রমণী শয্যাশায়ী সুকুমারের প্রতি চাহিয়া রহিল। পরে হৃদয়ভেদী চীৎকার করিয়া মরণাহতের শীতল দেহের উপর লুটাইয়া পড়িল—সুকু—সুকু—বাবারে আমার!

সুকুমারের অবশ কর্ণেও বোধ হয় মাতার সেই মর্ম্মভেদী আহ্বান পৌঁছিয়া থাকিবে, বারেক সে চক্ষু চাহিল—অতি মৃদু অতি অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—'মা!' পর মুহূর্ত্তে বার কতক শিহরিয়া সমস্ত স্থির হইয়া গেল।

যুবা ছাত্রটী তৎক্ষণাৎ ঘণ্টা-ধ্বনি করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তারসাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন। ডাক্তারসাহেব পরীক্ষান্তে বলিলেন—সমস্তই শেষ হ'য়ে গেছে। এতটা শীগ্গীর এমন হ'ল কেন—নির্ম্মল? যুবা বুঝাইয়া দিল ইঁহার মাতা আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই উত্তেজনায় মৃত্যু হইয়াছে।

...ডাক্তারসাহেব মৃতদেহ সৎকারের অনুমতি দিয়া চলিয়া গেলেন।

* * * * *

তখন হাঁসপাতালের সুমুখের বড় রাস্তায়, মোটরে বসিয়া বিজয়া মৃদু, অনুচ্চ স্বরে রাধারমণকে সান্ত্বনা দিতেছিল—বাড়ী চলুন বাবা! সব তো শেষ হ'য়ে গেছে—আর কী দেখবেন?

* * * * *

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে নির্ম্মল, সুকুমারের মাতাকে বলিল—মা, আমিও ত আপনার সন্তান, আমাকে নিয়ে বাড়ী চলুন মা! এই ঘাটে আর কি করবো বোসে থেকে? যদি আজীবন বোসে থাকলে তাঁকে একবার দেখতে পেতাম, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি—আমি তাও থাকতাম।

রমণী নির্ম্মলের তরুণ দেহটি বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—না বাবা নির্ম্মল! তুমি সতীর সন্তান, এ অসতীর কাছে থেকো না। আমি বিশ্বনাথের পাদপদ্মে স্থান নিতে যাচ্ছি;...সে ত আমার সন্তান ছিল না নিমু, আমার পরমেশ্বর ছিল! পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছিল সে, নইলে যে দিন তাকে বুকে কোরে মাস মাস অনাহারে কাটিয়েছি—সেদিন এই কাল যক্ষ্মা রোগ কোথায় ছিল নিমু? যেদিন ওর জীবন রক্ষা করবার জন্যে নিজের জীবন ধ্বংস কোরে ফেলেছিলাম, সেদিন বজ্রাঘাত কোথায় ছিল বাবা? আর লোভ দেখিও না, আমি এক খানা উইল কোরে সেখানে গিয়ে পাঠিয়ে দেব, তুমি তার ব্যবস্থা কোরে দিও!...সব আমি মেডিকেল কলেজকে দিয়ে গেলাম।

শেষ